দেখে আসা ভ্রমণ বৃত্তান্ত
ননী গোপাল দাশ

দেখে আসা ভ্রমণ বৃত্তান্ত

নদী গোপাল দাশ

দেখে আসা ভ্রমণ বৃত্তান্ত
নানী গোপাল দাশ

প্রথম প্রকাশ ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মদিনে
২৫শে বৈশাখ, ১৪১৯ বাং (৮ই মে, ২০১২ ইং)

প্রকাশক ঃ শাশ্বতী ভাবনা প্রকাশনী
ভোলানন্দ পল্লী, কুঞ্জবন, আগরতলা-৭৯৯০০৬
ত্রিপুরা (পঃ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ (১) ননী গোপাল দাশ
২৭ডি/৪ অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স
ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫২
মোবাইল ঃ ৯৭৪৮০১৭৩৩৪
(২) শাশ্বতী ভাবনা প্রকাশনী
শ্রীশ্রী ভোলানন্দ সেবাশ্রম,ভোলানন্দ পল্লী,
কুঞ্জবন, আগবতলা-৭৯৯০০৬, ত্রিপুরা (পঃ)

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা

উৎসর্গ

ভ্রমণ পিপাসু যাত্রীদের
উদ্দেশ্যে নিবেদিত

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

আমার জন্ম পার্বত্য ত্রিপুবার রাজধানী আগবতলায় ১৯৩১ সালে ১লা জুন, বর্তমান বিদুরকর্তা চৌমুহনীস্থিত বাড়িতে। কর্মসূত্রে বাবা স্বর্গীয় বাধাকৃষ্ণ দাশ ১৯১৭ সালে রাজপরিবারেব ছেলেদেব পড়াশুনার দায়িত্ব নিযে আগরতলায় স্থাযীভাবে বসবাস করেন। ১৯৫০ সালে অক্টোবর মাসে বাবা হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। আমরা ৫ ভাই, ১ বোন ও মা সম্পূর্ণ অসহায়। আমি ও দিদি ম্যাট্রিক পাশ কবেছি। তখন দিদি ত্রিপুরার বাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তৎকালীন কংগ্রেসেব কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছায় আমরা ভাই বোন প্রাথমিক বিদ্যালযে চাকুবি পাই। আর্থিক সঙ্কট কিছুটা লাঘব হলেও অভাব অনটন লেগেই আছে। পাঁচ ভাইয়ের লেখাপড়া। আমবা ভাই বোন এত অভাবের মধ্যে পড়াশুনা চালিযে যাই। আমি ও দিদি স্নাতকোত্তব পাশ কবি, সংসাবে কিছুটা আর্থিক উন্নতি আসে। এক সময়ে ত্রিপুবাব বিভিন্ন স্কুলে চাকুরি করি। ১৯৫৮ সালে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীতে বদলি হযে আসি। নবপ্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কমার্স কোর্সের উপব দিল্লিতে ১ মাসের ট্রেনিং নিই।

আমাব অদম্য ইচ্ছা কাস্টিং এবং এম কম পড়ার। দিল্লি থেকে ফিবে এসে ১৯৫৯ সালে প্রধান শিক্ষক শীতিকণ্ঠ সেনকে জানিয়ে ছুটিতে কলকাতায় পাড়ি দিই।

এম কম ও কস্টিং পড়ার সাথে সাথে অর্থনীতি বিষয়ে লেখা পত্রিকায় পাঠাতাম আমার বন্ধু অপাংশু লোধেব সাপ্তাহিক পত্রিকা "ত্রিপুরা টাইমস"এ।

কলকাতায় পড়াশুনা শেষ কবে আগরতলায় ফিরে আসি। তৎকালীন ত্রিপুরাব মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের আগ্রহে — Financial Advisor & Chief Accounts Officer এব পদ নিযে, খাদি ও ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডে (সরকাবি সংস্থা) ১৯৬৮ সালে যোগদান কবি।

চাকুরি জীবনে খুব একটা লেখার সুযোগ ছিলনা। ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকায় ইংরেজিতে শিল্প বাণিজ্যের লেখা দিযে যেতাম — বন্ধু অপাংশু লোধের কাছে। ১৯৮৯ সালে অবসর নিই। তখন লেখার সময় হাতে এসে গেল। তখন বাংলায়

বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনির উপর লিখতাম — ত্রিপুরা দর্পণ, স্যন্দন ও দৈনিক সংবাদে। চাকুরি জীবনে আগরতলায় একাউন্টেন্স Institute of Cost & Works Accountant শাখা অফিসের স্থাপন, আগরতলায় মাত্র ৬/৭ জন অ্যাকাউনটেন্ট চেষ্টায় এটা সফল হয়। অবশ্য প্রাক্তন সভাপতি N.K. Bose এর সহায়তা ও ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক সাহায্য ও ছিল। আগরতলা চাপ্টার অব কষ্ট একাউন্টেস এর প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয় ১৯৮৬ সালে ১২ ডিসেম্বর। পূর্বাঞ্চলে গুয়াহাটির পর আগরতলা চাপ্টার অব কষ্ট একাউন্টে এর আমরা ৫/৬ জন কষ্ট অ্যাকাউনটেন্টের পক্ষে ক্লাসের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হত না। কলিকাতা থেকে faculty এনে ক্লাস চালাতাম — সরকারি সাহায্যে। আমি Chairman ছিলাম ১৪ বছর। তাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতাম। প্রায়ই সেমিনার হত, ম্যাগাজিন ছাপা হত — যথেষ্ট পরিশ্রম করতাম - কিন্তু আনন্দ ও ছিল। আমাদের Session opening এ ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন সেক্রেটারী শ্যামল ঘোষ, দামোদরন, আরো অনেকে।

দ্বিতীয় উল্লেখ্য কাজ ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে Golden Public Celebration of North Eastern states. এতটা সাফল্য নিয়ে এ কাজ হবে ভাবিনি। ৮০,০০০ টাকা সংগ্রহ। ইনস্টিটিউশন এর মেম্বারদের উপস্থিতি ও ত্রিপুরা সরকারের সাহায্য সব মিলিয়ে আগরতলা পুর ভবনে এই অনুষ্ঠান হয়। শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন S.C. Jamir, CM, Nagaland, S.C. Marak, CM. Meghalaya. Mata Prasad, Governor, Arunachal, Mother Teresa অনিল সরকার ও তপন চক্রবর্তী এই মন্ত্রীদ্বয় এর উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০০০ সালে কলিকাতায় চলে আসি। তখন থেকেই বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের চিত্র এঁকে লিখতে চেষ্টা করি। ১৯০৪ সালে কেদার বদ্রী, যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী রানিক্ষেত কৌশলী ঘুরে এসে সর্বদাই একটি সজীব চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি পাঠকের সামনে। জানিনা কতটুকু সফলতা এসেছে।

ননী গোপাল দাশ

২৭ডি/৪ অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স

ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫২

মোবাইল ঃ ৯৭৪৮০১৭৩৩৪

Prof. (Dr.) Sitanath Dey
MA. (Goldmedalist) Ph.D.
Vedashri, Bharat Gaurav,
Formerly Professor of Sanskrit & Dean,
Faculty of Arts & Commerce, Tripura University
Secretary : Sri Aurubinda Society, Agartala Br.
President : Sanskrit Bharati, Tripura
" Vedic Mathematical Forum, Tripura
" Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Tripura
" Veda Vidya Prasaran, Samiti, Tripura
Fellow Mamber United Writers' Association
Editor, Shaswati Bhavana

(0381) 220-2333524 (R)
Mobile : 9436137785
"Vedashri"
Ramnagar Road No.-5,
P.O. Ramnagar,
Agartala-799002
Tripura, India.

প্রাক্ - কথন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এবং সনাতন বৈদিক ঐতিহ্যে গন্ডীবদ্ধ প্রাত্যহিক জীবনের বেড়াজাল ভেঙে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা উৎসারিত হয়েছে আলোকসামান্য-'চরৈবেতি' মহামন্ত্রের মাধ্যমে। বৈদিক সাহিত্যের পরম উদ্দীপক তথা উজ্জীবক এ বাণীটি স্মরণাতীত বৈদিক যুগের হাজার হাজার বছরেব ব্যবধান অতিক্রম করে আজও অম্লান — আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এ চিরায়ত বার্তা — 'এগিয়ে চলাই জীবন, থেমে থাকাই মৃত্যু'; নিয়ত এগিয়ে চলা, ভ্রমণ ও পরিক্রমার মাধ্যমে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার রসাল ফলের আস্বাদন সম্ভব—যা আমাদের আপাতঃ নিরানন্দ জীবনে অনাবিল আনন্দের প্রবাহ নিয়ে আসে। ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি আমাদের এই বসুন্ধরা তার মাঝে উত্তম দেশ আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ — সৌন্দর্য বৈচিত্র্য ও বিস্তারে উপমহাদেশ সদৃশ; এক জীবনে এ দেশের সকল দর্শনীয় স্থানের পরিক্রমা সম্ভব নয়। যাঁদের মধ্যে পূর্বোক্ত এগিয়ে চলার

প্রেরণা রয়েছে তারা অবকাশ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে। এসব ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের ভ্রমণের পেছনে থাকে নানা উদ্দেশ্য, বিবিধ দৃষ্টিকোণ। "দেখে আসা ভ্রমণ বৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, সিকিম প্রভৃতি কিছু কিছু অংশের দ্রষ্টব্য স্থানে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা তুলে ধরছেন লেখক শ্রী ননীগোপাল দাশের সাবলীল লেখন শৈলীর মাধ্যমে। কামার পুকুর জয়রাম বাটি হয়ে বিষ্ণুপুর সফর', 'আলমোড়ায় বিবেকানন্দ', তারকেশ্বর মন্দিরের স্মৃতি, দার্জিলিং সফর, আসাম সফর — কামাখ্যা মন্দির', সিকিম সফর'— ইত্যাদি বৈচিত্র্যধর্মী ভ্রমণবৃত্তান্তে লেখক ঐসব স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানিক বৈশিষ্ট্য সহ বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন -— যা পাঠ করে ঐ সব অঞ্চলে ভ্রমণাভিলাষী মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন আঙ্গিকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা শ্রীযুক্ত দাসের এ ভ্রমণ বৃত্তান্তটি অবশ্যই সুখপাঠ্য এবং একটি সজীব বর্ণনার উপস্থাপন বলে আমি মনে করি। পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত বেশ কয়েকটি রচনা ইতিপূর্বে 'শাশ্বতী ভাবনা' নামক সাহিত্য - সংস্কৃতধর্মী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পাঠকবৃন্দের প্রশংসাধন্য হয়েছে। আলোচ্য ভ্রমণবৃত্তান্তবাহী গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে

কামার পুকুর জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণুপুর সফর

আমরা ৮ জন একটি টাটা সুমো নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি-কামার পুকুর, জয়রাম বাটী বিষ্ণুপুর, ফেরার পথে তারকেশ্বর দেখার জন্য। আমরা ৮ জন - সস্ত্রীক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সঙ্গে শালকের মেয়ে সর্মী, সস্ত্রীক আমি, সস্ত্রীক সত্য ভট্টাচার্য ও কাশীনাথ দাশ। সবাই আমরা আগরতলার। সকাল ৭টায় অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে পড়ি। যশোর রোড, নাগের বাজার, দমদম হয়ে দক্ষিণেশ্বরকে বাঁ'পাশে রেখে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। পথে কালীতলা চণ্ডীপুর জঙ্গল বাজার হয়ে, তারকেশ্বরকে, ডানদিকে রেখে আরামবাগ হয়ে আমরা ১১.১০ মি. কামারপুকুর পৌঁছি। গতদিন সন্ধ্যায় টেলিফোনে রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগাযোগ করি। টেলিফোন নং ০৩২১১/২৪৪২২। আমাদের জানায় ১১টার মধ্যে আসতে পারলে প্রসাদ পাবেন---নাম লিখে রাখল। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ায় প্রসাদ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। প্রচুর লোক সমাগম হয়।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্ম ভূমি কামার পুকুর এখন দেশ বিদেশের ভক্তদের কাছে এক পুণ্য তীর্থ। এখানেই জন্ম নিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি)। পিতা ক্ষুদিরাম, মাতা চন্দ্রমণি। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মূল ফটক দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। জন্ম স্থান ওই সময় একটি ঢেকিশাল রূপে ব্যবহার করা হত। জন্মস্থানটির ঠিক উপরেই নবনির্মিত মন্দিরের বেদি রয়েছে। এখানেই ১৯৫১ সালে ১১ই মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মগ্রহণ কালীন পরিবেশটির স্মারক হিসাবে উক্ত বেদিটির সামনে একটি ঢেকি, চুল্লি ও প্রদীপ বসানো রয়েছে।

সেখান থেকে আমরা পশ্চিম দিকে যাই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের বাসগৃহ দেখতে। দক্ষিণদ্বারী ঘর, কামার পুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে বাস করতেন। ঠাকুর সারদা মাকে এক সময় বলেছিলেন "কামার পুকুরে থাকবে শাক বুনবে, শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে, তোমাকে ভক্তরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামার পুকুরের নিজের ঘর খানি নষ্ট করোনা" তাই

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমা অনেক অভাব অনটন সত্ত্বেও কামার পুকুরের এই পর্ণ কুটিরে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। বর্তমানে এই ঘরটি ঠাকুরের শয়ন ঘর হিসাবে রক্ষিত আছে। আরেকটি দক্ষিণদ্বারী ঘর বর্তমানে ঠাকুর মন্দিরের ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাসগৃহের বৈঠকখানা ঘরে বসে বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও জিজ্ঞাসুদের ধর্মোপদেশ দিতেন। বাসগৃহে প্রবেশ করার দরজাটি এখনো আগের জায়গাতেই রয়েছে।

পূর্ব দিকে রয়েছে শ্রী রঘুবীরের মন্দির - মাটির দেওয়াল, খরের ছাউনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তৈরির সময় এই ঘরটি পাকা করা হয় — সব কিছু অপরিবর্তিত রেখে। ঠাকুরের পূর্ব পুরুষেরা বহুকাল থেকেই রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রামেশ্বর শিব, গোপাল মূর্তি, একটি নারায়ণ শিলা এবং ঘট রূপিনী মাতা শীতলা দেবী আজও পূজিত হচ্ছেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব (তেখন বালক গদাধরের বয়স দশ) উপনয়নের পর কিছু কাল অশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে রঘুবীর, শীতলা দেবী ও রামেশ্বর শিবের সেবা পূজা করেছিলেন।

মূল প্রবেশ দ্বার সংলগ্ন মন্দির প্রাঙ্গণের বাঁদিকে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ আমগাছ। - যেটি ঠাকুর নিজের হাতে পুঁতেছিলেন। প্রাচীন এই আম গাছটি এখনও ফল দিচ্ছে।

বাঁদিকে একটু এগিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে ডানদিকে লাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ। সামনে নাটমন্দিরে রোজ সকালে ও দুপুরে পাঠশালা বসত। বালক গদাধর পাঁচ বছর বয়সের সময় এই পাঠশালায় যান। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে অল্প বয়সেই সাধারণভাবে লিখতে পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন। পিছনে কিছু দূর গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম সেই কামার পুকুর — যে নামে এই গ্রামটি আজ বিখ্যাত। প্রবাদ আছে এখানকার কামাররা এই পুকুর খনন করেছিলেন।

তারপর আমরা রওনা হই জয়রাম বাটীর উদ্দেশ্যে। দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। আমরা ২টা নাগাদ জয়রাম বাটী পৌঁছে যাই। কামার পুকুর হুগলী জেলায়, জয়রাম বাটী বাঁকুড়া জেলায়, শ্রীশ্রী মায়ের স্মৃতি ধন্য পুণ্য জন্মভূমি।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে ব্রাহ্মণ দম্পতি

শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর গৃহে শ্রী সারদা মা জন্ম গ্রহণ করেন। পল্লির শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠা বালিকার বয়স তখন পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয় ২৪ বছরের যুবক শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে। জয়রামবাটীর সঙ্গে শ্রী ঠাকুরের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত। বিয়ের পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ দেব কয়েকবার জয়রাম বাড়িতে এসেছিলেন।

আমরা প্রথমে সেখানে সিংহবাহিনী মন্দির দর্শন করি। জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির খোলে ৩টায়। এই অবসর সময়ে আমরা মা সারদা দেবীর আদি বাসস্থানটি দেখি। একটি মাটির ঘর, সেখানে মা সারদা তার ভ্রাতা প্রসন্নর সঙ্গে দীর্ঘ দিন ছিলেন (১৮৬৩-১৯১৫) শ্রীমায়ের ভাইদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার সময় এই বাড়িটি মায়ের ভাই প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ভাগে পড়ে। পরবর্তী কালে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ প্রসন্নর ছেলের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মায়ের পূর্ণ স্মৃতিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

তারপর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। ডানদিকে রয়েছে লাইব্রেরী ও বিক্রয় কেন্দ্র, তারপর অফিস বাঁদিকে উন্মুক্ত মাঠ - চারিদিকে ফুলের বাগান, মাঠের ওপারে রয়েছে সাধু নিবাস। একটু এগিয়ে বাঁদিকে মাতৃমন্দির। শ্রী সারদা মায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদি বাস্তুভিটা এই মন্দির। মন্দিরের গর্ভ গৃহে যেখানে বর্তমানে সারদা মায়ের মর্মর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক সেই খানেই জন্মেছিলেন তিনি। মা সারদার নয় বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়িতেই ছিলেন তাঁর বাবা মার সঙ্গে। বাংলা ১৩৩০ সালের ৬ই বৈশাখ (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল) অক্ষয় তৃতীয়ায় মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। এই মন্দিরে নিত্য পূজার পাশাপাশি প্রতিবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হয়। এই পবিত্র মন্দিরে মায়ের শ্বেত পাথরের বিগ্রহটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৪ সালে ৮ই এপ্রিল মন্দিরের সঙ্গেই মন্দির নির্মাণের সময় মাটি খুঁড়ে পাওয়া একটি শিব লিঙ্গ ও একই সঙ্গে স্থাপিত রয়েছে গর্ভগৃহে। এই নবনির্মিত মাতৃ মন্দিরে মা ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। মন্দিরের সামনে রয়েছে ঘাট বাঁধানো পূণ্য পুকুর। পুকুরের ওপারে সুন্দর নারায়ণ ও শীতলা মাতার মন্দির শ্রী সারদা মায়ের পাদস্পর্শে ধন্য জয়রাম বাটীর অন্যান্য

স্থান-আমোদর নদী, মায়ের স্নানের ঘাট, সিংহ বাহিনী মন্দির, পুণ্য পুকুর, ধর্ম ঠাকুরের মন্দির, বাড়ুর্যের পুকুর, ভানুপিসির বাড়ি। অনেক দিনের আশা কামার পুকুর জয়রাম বাটী দেখব। আজ আনন্দে মনটা ভরে গেল। জয়রাম বাটী থেকে ৪টায় আমরা রওনা হই বিষ্ণুপুরের উদ্দেশ্যে। ৫টা নাগাদ বিষ্ণুপুর পৌঁছে যাই। প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি, সভ্যতা কত উন্নত ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীত সে তো আজও বাহবা কুড়ায় জলসা ঘরে। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, সঙ্গীতাচার্য্য যদুভট্ট বিষ্ণুপুর ঘরানাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন দেশের চারিদিকে। মল্লরাজদের বিভিন্ন কীর্তি, তাদের উদ্যোগে তৈরি বিখ্যাত সব টেরাকোটায় সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুর। মল্লরাজ জগৎ মল্ল রাজধানীর জন্য বেছে নিয়েছিলেন এই বিষ্ণুপুরকে। ১৬ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত অসংখ্য মন্দির তৈরি করেছিলেন মল্লরাজারা। রঘুনাথ সিংহ, বীর হাম্বির, বীর সিংহরা বিষ্ণুপুরকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন। কলেজ রোড 'মোনালিসা' হোটেলে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়ে পড়ি কেনাকাটার জন্য — বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বালুচরী ও স্বর্ণচরী আর টেরাকোটার মৃৎশিল্প সামগ্রী।

পরদিন ১২ মার্চ রবিবার ভোরে প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ি গাড়ি নিয়ে বিষ্ণুপুরের দ্রষ্টব্য মন্দির ও স্থানগুলি দেখার জন্য — রামকৃষ্ণ কলেজ রোড দিয়ে এগিয়ে বাঁদিকে মল্লরাজ হাম্বির ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পিরামিড আকৃতির এই মন্দির ভারতে আর কোথাও নেই। গর্ভগৃহের তিন পাশে রয়েছে চালা দেওয়া খিলান যুক্ত পথ। অতীতে এখানে রাসের সময় সমস্ত দেবতার বিগ্রহ একত্রিত করে বিশাল উৎসব হত। এই রামকৃষ্ণের কাউন্টার থেকে ৫ টাকা দিয়ে টিকিট ক্রয় করি - বিষ্ণুপুরের সব মন্দির দেখার অনুমতি পত্র। দলমাদল কামান — এই কামান দিয়ে বর্গী আক্রমণ করেছিলেন রাজা গোপাল সিংহ। সোয়া এগার ইঞ্চি মোটা নলের এই কামান সারে চৌদ্দ ফুট লম্বা, ওজন তিনশ মন। এই বিখ্যাত কামানটি আজও মরচে হীন অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

একটু এগিয়ে ছিন্নমস্তার মন্দির — ভিতরে দেবী ছিন্নমস্তা, আর ডাকিনী যোগিনীর মূর্তি রয়েছে। এক পাশে কালা চাঁদ, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ ও রাধেশ্যাম

মন্দির তাঁর পাশে রয়েছে নন্দালয় মন্দির।

মদনমোহন মন্দির — ১৮৯৪ সালে মল্লরাজ দুর্জ্জুন সিংহ বীরভূম থেকে মদন মোহনের বিগ্রহ এনে এই মন্দির তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফেরার পথে দেখে নিই রঘুনাথ সিংহের তৈরি পাথরের রথ। রথ দেখে প্রবেশ করি পাথরের দরজা দিয়ে, শত্রুপক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেনারা এখানে পাহারা দিত। এর বাঁদিকে রয়েছে লালাজির মন্দির। বর্তমানে বিগ্রহটি কৃষ্ণভক্তের নতুন মন্দিরে আছে। মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির — মল্লরাজ জগৎমল্ল ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা কবেন। মন্দিরের অন্দরে রয়েছে মা মৃন্ময়ীর পট। প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা হয়। এটি রাজপরিবারে গৃহ দেবতা। তবে রাজবাড়ির সেই কৌলিণ্য এখন আর নেই। বয়সের ভারে আর সংস্কারের অভাবে সে আজ অতীতের শুধু সাক্ষী মাত্র।

শ্যাম রায়ের মন্দির — মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খৃঃ এই ভিন্ন ধাঁচের মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দির শিখরে রয়েছে চার চালা পঞ্চরত্ন, মন্দিরের গাত্রে টেরাকোটার পেনেলে দেবদেবীর নানা দৃশ্য, হিন্দু পুরাণের রামলীলা অলংকৃত রয়েছে।

গুমঘর — দরজা জানালা বিহীন বিশাল একটি চার কোণা ঘর। কথিত আছে অপরাধীদের এই ঘবে আবদ্ধ করে হত্যা করা হত।

পাশে রয়েছে একটু দূরে জোড়া শিব মন্দির, লালাদের বাড়ি, শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমাধি, সর্বমঙ্গলা মন্দির, লাল দিঘি।

যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন — সেখানে রয়েছে বাঁকুড়ার শিল্প সংস্কৃতির সহিত জড়িত নানা প্রত্ন সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি, প্রাচীনমুদ্রা, বালুচরী ও স্বর্ণচরী শাড়ি ও নানা ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী। সফর শেষে আমরা তাঁতীপাড়ায় যাই বালুচরী ও স্বর্ণচরী শাড়ি কিনবার জন্য।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাঁকুড়াকে জানতে হলে আরো সময় নিয়ে দেখা ও আলোচনার প্রয়োজন। হোটেলে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। বেলা ৩টা নাগাদ আমরা গাড়িতে রওনা দিই কলকাতার উদ্দেশ্যে। পথে তারকেশ্বর দর্শন করি।

GUIDE MAP
HIMALAYAN SHRINES
Some Important Places With
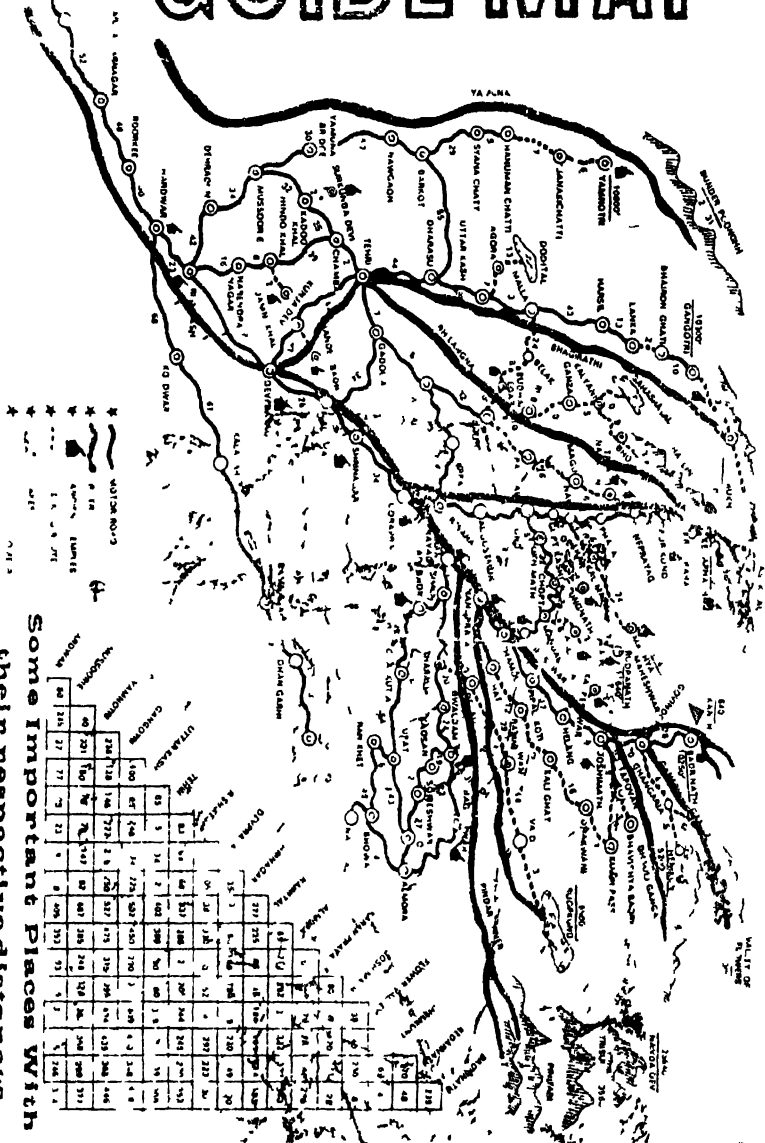
আলমোড়ায় বিবেকানন্দ

দিল্লি থেকে আলমোড়া বাসে যাওয়া যায়, ৩৭৮ কিমি, সময় লাগে বারো ঘণ্টা। আবার লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগোদাম (৩৭৮ কিমি) ট্রেনে যাওয়া যায়। সেখান থেকে বাসে তিন ঘণ্টা। আমরা অবশ্য হরিদ্বার হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা পাঁচজন সবাই ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মিতা চক্রবর্তী, ননী গোপাল বৈদ্য, অঞ্জু বৈদ্য ও ননীগোপাল দাশ। চিঠিপত্র দিয়ে হরিদ্বার রামকৃষ্ণ মিশনে থাকার ব্যবস্থা করি। সেখান থেকে অ্যাম্বেসেডর নিয়ে এই সফরে যাই। ভোর আটটায় রওনা হয়ে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ নৈনিতাল পৌঁছি। নৈনিতাল একটি সুন্দর শহর, পাহাড়ের গায়ে নৈনিতাল লেকের চারিদিকে বিস্তৃত। হ্রদের তীরে আর পাহাড়ের উপরে বনরাজির সৌন্দর্য অপূর্ব। হ্রদে নৌকা বিহার এখানের এক বিশেষ আকর্ষণ। আকাশপথে রোপ ওয়েতে ভ্রমণ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা — হিমালয় ও হ্রদ শহর দর্শন। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ৬৮১৪ ফুট — উত্তরে ৬৮ কিমি দূরত্বে আলমোড়া। এখান থেকে ৫ থেকে ২৫ কিমি দূরত্বে রয়েছে মৈনা শৃঙ্গ, ভীমতাল, সাততাল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। পাহাড়ের গায়ে হনুমান মন্দির ও নৈনা দেবীর মন্দির। একটু দূরত্বে আছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কৃষি বিদ্যালয়। পরদিন ভোরে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—আলমোড়ার উদ্দেশ্যে। পথে রানিক্ষেত, সমুদ্রতল থেকে ৬০০০ ফুট উচ্চ, তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য, মিষ্টি বাতাস আর অপূর্ব আবহাওয়ার জন্য যাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয়। রানিক্ষেত উত্তরাঞ্চলের মিলিটারী হেড কোয়ার্টার।

ভারতের মানচিত্রে উত্তরপ্রদেশের অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশে এক বিশিষ্ট সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল নিয়ে পরবর্তীকালে উত্তরাঞ্চল স্টেট গঠিত হয়। এর শিরোভাগে অবস্থিত জেলাগুলির মধ্যে আলমোড়া প্রধান। এক চক্ষুস্মান পুরুষের পাদস্পর্শে পবিত্র — সে পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ।

উত্তরাঞ্চলের পূর্ব অংশে আলমোড়ার অবস্থান। আলমোড়ার পশ্চিমে রয়েছে দেরাদুন, হরিদ্বার, যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদ্যারনাথ, বদ্রীনাথ, নৈনীতাল, রানিক্ষেত, কৌশুলী, আর পূর্বে রয়েছে মায়াবতী শ্যামলীতাল।

দিল্লি থেকে আলমোড়া বাসে যাওয়া যায় (৩৭৮ কিমি) সময় লাগে বারো ঘণ্টা। আবার লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগোদাম (৩৭৮ কিমি) ট্রেনে যাওয়া যায়। সেখান থেকে বাসে তিন ঘণ্টা। আমরা অবশ্য হরিদ্বার হয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা পাঁচজন সবাই ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মিতা চক্রবর্তী, ননী গোপাল বৈদ্য, অঞ্জু বৈদ্য ও ননীগোপাল দাশ। চিঠিপত্র দিয়ে হরিদ্বার রামকৃষ্ণ মিশনে থাকার ব্যবস্থা করি। সেখান থেকে অ্যাম্বেসেডর নিয়ে এই সফরে যাই। ভোর আটটায় রওনা হয়ে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ নৈনিতাল পৌঁছি। নৈনিতাল একটি সুন্দর শহর, পাহাড়ের গায়ে নৈনিতাল লেকের চারিদিকে বিস্তৃত। হ্রদের তীরে আর পাহাড়ের উপরে বনরাজির সৌন্দর্য অপূর্ব। হ্রদে নৌকা বিহার এখানের এক বিশেষ আকর্ষণ। আকাশপথে রোপ ওয়েতে ভ্রমণ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা — হিমালয় ও হ্রদ শহর দর্শন। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ৬৮১৪ ফুট — উত্তরে ৬৮ কিমি দূরত্বে আলমোড়া। এখান থেকে ৫ থেকে ২৫ কিমি দূরত্বে রয়েছে মৈনা শৃঙ্গ, ভীমতাল, সাততাল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। পাহাড়ের গায়ে হনুমান মন্দির ও নৈনা দেবীর মন্দির। একটু দূরত্বে আছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কৃষি বিদ্যালয়। পরদিন ভোরে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—আলমোড়ার উদ্দেশ্যে। পথে রানিক্ষেত, সমুদ্রতল থেকে ৬০০০ ফুট উচ্চ, তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য, মিষ্টি বাতাস আর অপূর্ব আবহাওয়ার জন্য যাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয়। রানিকক্ষেত উত্তরাঞ্চলের মিলিটারী হেড কোয়ার্টার। ১১টা নাগাদ আলমোড়ায় পৌঁছে যাই। সেখানে রামকৃষ্ণ কুটিরের মহারাজের পত্রে যোগাযোগ

লেখকেব বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও স্ত্রী সঙ্গে বন্ধু ননীবাবুব স্ত্রী - আলমোড়া

বিশিষ্ট
স্টেট গ
এক চক্ষ্

রয়েছে
রানিক্ষে

বারো ঘ
সেখান

শ্যামাপ্রস
দাশ। চি
অ্যাম্বেসে
নাগাদ কৈ
লেকের
অপূর্ব। হ্র
ভ্রমণ এব
উচ্চতা
থেকে ২
স্থান। পা
গোবিন্দ
পড়ি—ত
তুষারাবৃত
জন্য আক
আলমোড়

করে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী চিন্ময়ানন্দ অতিথি কক্ষে একটু অসুবিধা থাকায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। সুন্দর ব্যবস্থা — স্নানের জন্য আলাদা বাথরুম ও গরম জলের বন্দোবস্ত রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলে আলমোড়ার একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আলমোড়ার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য অনেকে আলমোড়ায় আসেন। সমুদ্রতল থেকে আলমোড়ার উচ্চতা ৪৯৩৮ ফুট। দিল্লি থেকে আলমোড়ার দূরত্ব ৩৭০ কিমি। প্রকৃতি ও পর্বতপ্রিয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বার দুই (১৯০৩, ১৯৩৭) আলমোড়ায় এসে থেকেছেন এবং তার "শিশু", "ছড়ার ছবি", "সেজুতি"র অনেকগুলি নিয়ে চল্লিশটির বেশি কবিতা আলমোড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশে বসে লিখেছেন। স্বাস্থ্যের আকর্ষণ ছাড়া আলমোড়া, কর্ণ প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, কৈলাস প্রভৃতি তীর্থে যাওয়ার অন্যতম পথও।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তদের মধ্যে অন্যতম স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর) হিমালয় অঞ্চলে ও তিব্বতে অনেক ঘুরেছিলেন। এদের মধ্যে তিনি প্রথম আলমোড়ায় যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তরের পর নরেন্দ্রাদি (বিবেকানন্দ প্রমুখ ত্যাগী যুবকগণ) বরানগর মঠে থাকতেন। কিন্তু ত্যাগ ও তপস্যার প্রবল আকাঙক্ষা তাদের ছিটকে বার করে নিয়ে যায় ভারতের নানা ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দ কয়েকবার এখানে ওখানে ঘুরে, শেষে হিমালয়ের এক নির্জন স্থান খোঁজ করার উদ্দেশ্যে অখণ্ডানন্দকে সঙ্গী করে কাঠগোদাম হাজিব হলেন। ১০০ বছর আগের কথা, রাস্তা কিছুই ছিল না। দণ্ড, কমণ্ডলু আর ভিক্ষান্ন সম্বল করে বিবেকানন্দ ও অখণ্ডানন্দ পাহাড়ি পথে হেঁটে নৈনিতাল পৌঁছলেন। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু হলো আলমোড়ার পথে। বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন। তৃতীয় দিনে রাত কাটাবার জন্য একটি মনোরম স্থান দেখতে পেলেন। পথের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কোশী (কৌশিকী) নদী, অসংখ্য ছোট বড় নুড়ি আর পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যায়। অপরদিক থেকে সরোতা নদী এসে পড়েছে কোশীর বুকে। মাঝের ত্রিকোণাকৃতি ভূখণ্ড ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। তার উপর একটি প্রকাণ্ড

পিপুল গাছ, স্বামীজী বললেন, "কি চমৎকার ধ্যানের জায়গা।" কোশীতে স্নান করে স্বামীজী বসলেন সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল গভীর ধ্যানে। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙলে অখণ্ডানন্দকে বললেন, "আজ আমার এক গভীর জিজ্ঞাসার সমাধান হয়ে গেল। প্রথমে শব্দ ব্রহ্ম ছিল। অনুবিশ্ব আর বৃহৎ বিশ্ব একই পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্ট। জীবাত্মা যেমন জীবদেহে, বিশ্বাত্মা তেমনি প্রকৃতিতে অবস্থিত। বাক আর অর্থের মতই তারা অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মের এই দুই রূপ সনাতন। কাজেই আমরা যে জগৎ দেখি তা শাশ্বত নিরাকার ও শাশ্বত সাকারের সম্মিলন। এ জায়গার নাম কাকড়িঘাট, আলমোড়া থেকে ২৩ মাইল দূরে। সেখান থেকে পদব্রজে আলমোড়ার কাছাকাছি (৩ কিমি) এসে পৌঁছেছেন। তখন স্বামীজী পথশ্রমে ও প্রচণ্ড ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। পা ফোস্কায় ভরে গেছে। প্রায় অজ্ঞান হয়ে স্বামীজী তখন একখণ্ড পাথরের উপর শুয়ে পড়েন। অখণ্ডানন্দ দিশেহারা হয়ে জলের খোঁজ করতে ব্যস্ত হলেন। অনতিদূরে এক কবর স্থানের পাশে এক কুটিরের কাছে এক মুসলমান ফকিরকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেলেন। ফকিরের একটি শশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, "তাতে কি, আমরা সবাই কি ভাই নই?" শশাটি খেয়ে স্বামীজীর প্রাণ রক্ষা হল। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে দ্বিতীয়বার যখন আলমোড়ায় যান, আর তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তখন সভাস্থলে ভিড়ের মধ্যে সেই ফকিরকে দেখে স্বামীজী তাঁকে চিনতে পারেন এবং সভাস্থলে তাঁকে এনে তার দ্বারা তার জীবন রক্ষার কাহিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকলকে জানান।

স্বামীজী প্রথমবার যখন আলমোড়ায় গিয়ে পৌঁছলেন সেটা ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সেখানে পৌঁছে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ দেখলেন স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দ (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলমোড়ায় অপেক্ষা করছেন। এই শহরের অতি সজ্জন ব্যক্তি; ধনী হলেও ধনলাভের কালিমা যাঁকে স্পর্শ করেনি সেই লালা বদ্রীশা'র বাড়িতে বিবেকানন্দ উঠলেন। ১৮৮৯ সালে যখন স্বামীজী আলমোড়া যাবার কথা ভাবছিলেন তখন বদ্রীনাথ থেকে অখণ্ডানন্দ বদ্রী শাকে স্বামীজীর পরিচয় দিয়ে তার আলমোড়া যাবার ইচ্ছা জানান। স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে অখণ্ডানন্দ চিঠিতে

লিখেছিলেন যে বিবেকানন্দ শুধু উচ্চ শিক্ষিত নন, ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি কঠোর সন্ন্যাস জীবনযাপন করেন এবং তিনি পরমহংস পর্যায়ের এক উচ্চকোটি সন্ন্যাসী।

রামকৃষ্ণ সান্নিধ্য থাকাকালেই বিবেকানন্দ সমাধি আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তিনি ব্রহ্ম স্বাদেই ডুবে থাকতে পারেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন নরেন্দ্র লোক কল্যাণের জন্য উচ্চভূমিতে না থেকে মানুষের মাঝে নেমে আসুক। সেটা ঘটেছিল অলৌকিকভাবেই এই আলমোড়ায়। সেজন্য স্বামীজীর আলমোড়ার অবস্থান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লালা বদ্রী শা'র আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মন ছটফট করছিল অন্য কিছুর জন্য, নির্জনতার জন্য, গভীরতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য। তিনি একাকী বেরিয়ে পড়লেন। কাশার দেবী পাহাড়ের এক গুহায় চলল নিরবচ্ছিন্ন দিনারাত্রি কঠোর তপস্যা ।একান্ত নির্জনতায় নৈঃশব্দে ধীরে ধীরে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক দিব্য আলোকে চূড়ান্ত সত্যের প্রভায়। যেন বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণের "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান" কথার অর্থ। শুধু ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবে থাকা নয়, তিনিই সব হয়েছেন জেনে সর্ব জীবের কল্যাণই শেষ কথা। নরেনের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা বীজ অঙ্কুরিত হলো বিবেকানন্দের পরোক্ষ অনুভূতির প্রত্যয়ে।

আলমোড়ায় ফিরেই ভগিনীর জীবনান্তের করুণ সংবাদ পেলেন। কিছুটা বিচলিত। এর কিছুদিন পর আবার নিঃসঙ্গ একাকী পরিব্রাজক ভারত পথিক। সে ভারতকে চিনতে যার সেবার জন্য তার জন্মগ্রহণ। কত অঘটন ঘটে গেল। নিলাম্বুরাশি পেরিয়ে আমেরিকার আকাশে কালঝঞ্ঝার মাঝে বজ্রের মত ফেটে পড়লেন। হেয় ম্লানমুখী ভারত আবার জগতের সামনে আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিশ্বনন্দিত বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে ফিরলেন। সিংহল থেকে দেশজুড়ে অগণিত দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন আর প্রত্যুত্তরে স্বামীজীর অনবদ্য বক্তৃতামালায় ভারতের চারিদিক মুখরিত। এই কয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দার্জিলিং-এ কিছুদিন কাটিয়ে পুনঃ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আলমোড়া যেতে চাইলেন। ইতোমধ্যে কলকাতায় ১লা মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হলো। ৬ই মে ১৮৯৭ তিনি আলমোড়ার

দিকে পা বাড়ালেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আলমোড়ার বিশেষ আকর্ষণ ও প্রভাব রয়েছে। তার উদ্দেশ্য হিমালয়ের এ অঞ্চলে একটি আশ্রম স্থাপন করা, যেখানে কাজ প্রাধান্য পাবে না, প্রাধান্য পাবে শান্ত সমাহিত ভাব, আর ধ্যানের গভীরতা। এবার স্বামীজী আলমোড়ায় অনেকদিন ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়র ও শ্রীমতী সেভিয়র স্বামীজীর পরিকল্পিত আশ্রমের জন্য হিমালয় অঞ্চলে স্থান সন্ধান করতে লাগলেন। সেভিয়র দম্পতি ও স্বামীজী অনেক চেষ্টা করেও আলমোড়ার কাছে কল্পিত আশ্রমের জায়গা পেলেন না। অবশেষে সেভিয়র দম্পতির চেষ্টায় আলমোড়া থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হলো। ১৮৯৯ সালে প্রবুদ্ধ ভারতের কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়— মাদ্রাজ থেকে। আলমোড়া পর্বত শিখরের পশ্চিম প্রান্তে ব্রাইট এন্ড কর্ণারের পাশে পাহাড়ের ঢালে স্বামী তুরীয়ানন্দ রামকৃষ্ণ কুটির নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন ১৯১৬ সালে। এখান থেকে সিয়া দেবী পাহাড়টি অপূর্ব দেখায়। সেখানে পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন। সামনে কোশী নদীটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে। অনতিদূরে কিছু নীচে একটা পুরানো বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে, লাল বদ্রী শাহের 'চিল্কা পেটা হাউস'। এই বাড়ির সঙ্গে বিবেকানন্দ ও তাঁর সহকর্মী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং শ্রীমতি ওলিবুল, শ্রীমতি ম্যাকলিয়ও ও ভগিনী নিবেদিতার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আলমোড়ার এই রামকৃষ্ণ কুটির ও মায়াবতীর সাধনক্ষেত্র স্বামী বিবেকানন্দের বহু স্মৃতি বিজড়িত একটি তীর্থ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ কুটিরের কাছেই রয়েছে বিবেকানন্দ গবেষণাগার। স্বামীজীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের শিষ্য বশী সেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষি নির্ভর ভারতের জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত ও কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য এটি শুরু করেছিলেন। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এটি ছিল অগ্রণী। আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ কুটিরে থাকার সুবাদে আমাকে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এতকিছু জানার সুযোগ এনে দেয়। আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরের ছোট্ট লাইব্রেরীতে বসে এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। লাইব্রেরীর পরিচালক ব্রহ্মচারী রাজেন্দ্র মহারাজ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। পরদিন ভোরে আমি ও

শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশ্রম থেকে ৩ মাইল দূরে আলমোড়ায় বিবেকানন্দ প্রথম আসার সময় পথশ্রমে অনাহারে ক্লান্ত হয়ে যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন— সেখানে এখন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্রামাগার তৈরি হয়েছে, সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছি। আলমোড়া শহরের প্রবেশ পথে বাম পার্শ্বে রাস্তার সংলগ্ন। ১৯৭১ সালের ৪ঠা জুলাই এর উদ্বোধন হয়। স্বামীজীর স্মারক হিসাবে এটি একক। এর পাশ দিয়ে চমৎকার বড় রাস্তা। রৌদ্র বর্ষা তুষারপাতে যাত্রীরা এখানে আশ্রয় পেতে পারে। পাশেই সেই প্রস্তরখণ্ড আর অনতিদূরে কবরস্থানের পাশে সেই ফকিরের আস্তানাটি দেখা যায়। বিশ্রামাগারের কাছে জলের কলটিই এখানে পানীয়ের একমাত্র উৎস। কলটি চারিদিকে খোলা। দূরে হিমালয়ের শুভ্র শৃঙ্গরাজি চারিদিকে পাকা টবে নানা ফুল, তিনদিকে যাত্রীদের বসার জন্য গাঁথা বেঞ্চি আছে। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বসে সেই সুন্দর অনির্বাচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলাম এবং থামে খোদিত স্বামীজীর দশটি বাণী পাঠ করলাম। এতে আছে সেবা কর্ম, ধর্ম, আদর্শ, ঐক্য, বিশ্বাস, মুক্তি, চরিত্র, সত্য আর সর্বকালের সকল মহাপুরুষকে প্রণতি। এ বাণীগুলির প্রথমটি এরূপ:- "এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারাজীবনের আনুগত্য। এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে হয় তবে

সেই সহস্র জীবনের প্রতি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর

হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদের সেবায় ব্যয়িত হইবে।"

পরদিন ৮ টার মধ্যে স্নান সেরে আলমোড়াকে বিদায় জানিয়ে আমরা বিবেকানন্দের সাধনাক্ষেত্র মায়াবতীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা মায়াবতী পৌঁছে যাই। স্বামীজী পদব্রজে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও হিমালয়ের দুর্ভেদ্য জায়গা পরিভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে কল্পিত সাধনা ক্ষেত্রের সন্ধান মেলে মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়র দম্পতির সহায়তায়। বিবেকানন্দের প্রিয় সাধনা ক্ষেত্র পাহাড়ের উপর জঙ্গলাকীর্ণ এ স্থানটি নির্জন। ৪-৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোন বসতি নেই। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নির্জনতা — সাধনার পক্ষে খুবই উপযোগী। এখানে কোন মন্দির বা দেবদেবীর এমনকি রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের মূর্তি নেই। এখানে একটি ছোট লাইব্রেরী ও একটি ছোট হাসপাতাল আছে। মায়াবতীর ফুলের বাগান—চারিদিকে এই পাহাড়ে ঘেরা বনরাজির মধ্যে এক অনির্বচনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আশ্রমের অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা ৯ কিমি নীচে লোহারঘাটে একটি হোটেলে রাত্রির জন্য আশ্রয় নিই।

পরদিন ভোরে আমরা সবাই স্নান সেরে প্রাতঃরাশের জন্য প্রস্তুত হই। দুপুরে মায়াবতীতে খাওয়ার জন্য আমরা মহারাজকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। প্রাতঃরাশ সেরে দশটা নাগাদ মায়াবতীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেখানে আমরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের আউটডোরে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করি। এখানে ২৮টি বেড আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ দেওয়া হয়। যে ঘরটিতে স্বামীজী ধ্যান করতেন সেখানে এখনো সুন্দরভাবে যত্নে সবকিছু সংরক্ষিত আছে। এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। আশ্রমবাসীরা সবাই যুবক। খেলাধুলার সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম স্বামীজীর মূল সাধনা ক্ষেত্রটি এক কিলোমিটার উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায়। যখন সাধনায় বসতেন—তখন কয়েকদিন সেখানেই কেটে যেত। আশ্রম থেকে খাবার বয়ে নিয়ে যেত সেই পাহাড়ের চূড়ায়। ১২টায় আমরা ৪০/৫০ জন সেখানে খাওয়া-দাওয়া করি। সুন্দর ব্যবস্থা। নির্জনতার জন্য একটি অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। চারিদিকে ফুলে ফুলে সাজানো বাগান এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

আলমোড়ার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। যা বার বার বিবেকানন্দকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। আলমোড়া এককালে নাকি ভগবান বিষ্ণুর আবাসস্থল ছিল। স্কন্ধ পুরাণে এমন উল্লেখ আছে। কশায়া পাহাড়ের উপর ৫ কিমি লম্বা ঘোড়ার জিনের আকারের সরু চূড়ায় শহরটি অবস্থিত। প্রায় ১২ বর্গ কিমি এলাকায় এই শহরের জনবসতি (১৯৮১ আদম সুমারী অনুসারে) ২০,০০০ এর কিছু বেশি। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪.৪ থেকে ২৯.৪ সেলসিয়াস কমে-বাড়ে। বৃষ্টিপাত নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী বা দার্জিলিং এর তুলনায় কম, গড় ৩৭˝। বলা যায় নাতিশীতোষ্ণ, নাতি আর্দ্র। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে আলমোড়া বহুকাল প্রসিদ্ধ। এখান থেকে

উত্তরে নন্দাদেবী ত্রিশূল প্রভৃতি প্রায় ২০টি হিমালয়ের তুষার ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। ১৫৯২ সালে চাঁদ রাজাদের রাজধানী হিসাবে এই শহরের পত্তন। আলমোড়ার সঙ্গে স্বামীজীর বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে— যার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ কুটিরের লাইব্রেরীর পরিচালক ব্রহ্মচারী রাজেন্দ্র মহারাজ। স্বামী চিন্ময়ানন্দ এ সময়ে চামোলিতে (জিলা সদর) একটি ধর্মসভায় ব্যস্ত ছিলেন। লাইব্রেরীতে অনেক তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাই। আমি অবশ্য রামকৃষ্ণ কুটিরের e-mail rkutir@yahoo.co.uk মাধ্যমে স্বামীজী ও রাজেন্দ্র মহারাজকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

তারকেশ্বর মন্দিরের স্মৃতি

আজ একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এসে মনে হল তারকেশ্বরের মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু লেখা যাক। উনিশ শত ষাট দশকে প্রথম তারকেশ্বর যাই। তখন কলিকাতায় পড়াশুনা করি। ভাবলাম বাবার কৃপায় হয়ত পড়াশুনায় সাফল্য আসবে। যথেষ্ট উৎসাহ ছিল — কিন্তু কোন উপলব্ধি বা ভক্তির প্রেরণা পেলাম না — একটা ভয় ও কৌতুহল নিয়ে ফিরে এলাম। এরপর সপ্তদশ শতকে সদ্য বিবাহিত — সস্ত্রীক তারকেশ্বর মন্দির গিয়েছি। স্ত্রী আরতী দুধ পুকুরে স্নান করে ভক্তি ভরে পূজা দেয়। যথেষ্ট লোক সমাগম, কিছু কিছু দোকান পাট হয়েছে, হোটেলও ছিল। পান্ডাদের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা ছিল। আমরা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম কলিকাতায়। তৃতীয় বার আমি তারকেশ্বর যাই এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে— সঙ্গে আরতি ও মেয়ে সুস্মিতা। মেয়ে ২০০১ সালে আগরতলা হোলি ক্রস স্কুলের চাকুরি ছেড়ে কলিকাতায় আসে।। কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা পাবলিক স্কুলে (বাগুইআঁটি)তে জয়েন করে — ফিজিক্সের টিচার হয়ে। বিবাহের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে— কিছুটা চিন্তিত। কিছুটা উদ্বিগ্ন, চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তারক বাবার আকর্ষণে যাই তারকেশ্বর মন্দিরে — অনেক আশা নিয়ে। জানি না আশীর্বাদ কতটুকু পেয়েছি।

সেদিন রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গিয়েছিলাম সস্ত্রীক সঙ্গে শ্যামাবাবুর স্ত্রী ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে। ফেরার পথে আবার বাবার আকর্ষণে মন্দির চত্বরে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে আসলাম। প্রতিবারই দুটো দৃশ্য আমার মনকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে, জানবার কৌতূহল বেড়ে যায়। এক, হত্যে দিয়ে বাবার মাথায় জল দেওয়া, দুই কেশদান। মা বাবার মানত প্রথম কেশ দান তারকেশ্বরে। তাই দুধপুকুরে অবিরাম চলছে এই মাথামুন্ডন।

ইতিমধ্যে তারকেশ্বর বাবা তারক নাথের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি—

পত্র-পত্রিকা থেকে। তাই এই লেখা— এতদিন পর।

কলিকাতা থেকে ৩০-৪০ কি.মি., হাওড়া থেকে ট্রেনে যাতায়াত, যথেষ্ট ট্রেন রয়েছে। তারকেশ্বর স্টেশন থেকে ৫ মিনিট রাস্তা মন্দির প্রাঙ্গণ। চারিদিকে অজস্র দোকান পাট অজস্র হোটেল অজস্র গলি। মূল মন্দিরের সামনে অঙ্গন। সেটি পেরিয়ে নাট মন্দির। শিব মন্দিরের সংলগ্ন রয়েছে বিষ্ণু মন্দির, কালী, লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির। আছে শঙ্করাচার্যের্য্য মূর্তি ও মোহন্ত মহারাজদের উপর বারটি শিব মন্দির।

মূল মন্দিরের বাদিকে কিছুদূরে তারকেশ্বর এস্টেট বা রাজবাড়ি। এস্টেটে ঢুকেই বাঁদিকে বাগান পেরিয়ে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। বাঁদিকে এস্টেট ভবনে দোতালায় থাকেন বর্তমান মোহন্ত শ্রীমৎ দন্তস্বামী ঋষীকেশ আশ্রম। তিনি পুরো শ্রাবণ মাসটি থাকেন ঝাড়খন্ডের কাকো তারকেশ্বর মঠে। আগ্রহ নিয়ে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের খবর জানবার জন্য বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। অনেক কিছু জানতে পারি।

শ্রী জগন্নাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা অষ্টম বৎসর বয়সে ঢুকে বিদ্যারম্ভ করে। এখানে ব্যাকরণ কাব্য বেদ প্রভৃতি পড়ানো হয়। তারা পাঠান্তে আদ্য, মধ্য উপাধি লাভ করে। ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যয় ভার এস্টেট বহন করে। এস্টেটের কর্মীদের মাহিনাও দেয় এস্টেটই। তবে পুরোহিত, সেবাইত বা পান্ডাদের এস্টেট কোন মাহিনা দেয় না। এস্টেট কমিটিতে আছে পদমর্যাদা বলে ডি এম ও এস ডিও, ব্রাহ্মণ সমাজের এক প্রতিনিধি, রাও তাঁরা মল্লর সিংরায় সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের একজন প্রতিনিধি ও স্বয়ং মোহন্ত মহারাজ। ব্রহ্মচারী ছাত্রদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনায় জানা গেল বাবা তারকনাথের নিত্য পূজা পদ্ধতি—

ভোর চারটার সময় বাবার মন্দিরের দ্বারোন্মোচিত হয়। প্রথমেই হয় মঙ্গ লারতি। আতপ চাল ফল ইত্যাদি দিয়ে পূজা হয়। এ সময় কোন ভক্ত ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। এর পর সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত ভক্তরা দর্শন করতে

পারবেন ও পূজা দিতে পারবেন। তারপর বেলা ৯টা থেকে দশটা বিশেষ পুজা — ফুলকারানি পুজো। ২১ টাকার টিকিট কেটে ভক্তরা এই পূজা দিতে পারবেন। আবার দশটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত কোন ভক্ত ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। বারটা থেকে তারকনাথের যে পূজা হয় সেখানে পুরোহিত থাকতে পারবেন। কিন্তু পূজা করেন স্বয়ং মোহন্ত মহারাজ। এই পূজা শেষ হলে আবার ভক্তরা মন্দিরে ঢুকতে পারবেন। বাবার মাথায় জল ঢালতে পারবেন। আবার দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ফুলকারানি পূজা। ২১ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভক্তরা পুজো দিতে পারেন। বেলা ৩টার পর বাবার শৃঙ্গার বা রাজবেশ হয়। এসময় বাবার ভোগ হয়। তারকনাথের অন্নভোগ হয় না। লুচি, সন্দেশ, পায়েস, মিহিদানা জিলিপি দিয়ে বাবার ভোগ হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে হয় সন্ধ্যারতি। এ সময় বাবার শীতল ভোগ হয়।

এখানে উল্লেখ্য বাবার মাথায় জল দেওয়ার জন্য শত শত নর নারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাঁড়ে করে জল নিয়ে আসে বাবার মাথায় জল দেওয়ার জন্য। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দেখতে পাবেন দলে দলে ভক্তরা সুসজ্জিত ভাবে জল নিয়ে ছুটছে তারকনাথের উদ্দেশ্যে। পথে পথে দেখতে পারেন — বিভিন্ন সমিতির আয়োজিত বিশ্রামাগার বা সেবাকেন্দ্র — ভক্তদের জন্য। ধ্বনি দিতে দিতে ছুটছে — কলকাতার রাস্তায় ভক্তরা — ভোলে বাবা পার লাগাও। ত্রিশূলধারী পার লাগাও। ভোলেবাবা পার করেগা। এদিকে পুরো শ্রাবণ মাসে কোন ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। এই সময় বাবাকে জল দেওয়া হয় মন্দিরের দরজায় একটি চৌকো তাম্র পাত্রে। ঐ পাত্র সংলগ্ন একটি নলের মাধ্যমে জল গিয়ে পড়ে শিবলিঙ্গে।

এস্টেট কমিটিতে উল্লিখিত রাও ভারামমল্ল ও মোহন্ত মহারাজদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে তারকেশ্বর মন্দিরের উত্থানের কাহিনি, রয়েছে বিভিন্ন সময়ের রোমাঞ্চকর ঘটনা। শতশত মানুষ বাবার কাছে আসেন সেটাই রহস্য। কার মনের কথা কে বলতে পারে? শুধু জানেন স্বয়ং তারকনাথ।

রোগ, ব্যাধি, চাকুরি ব্যবসা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণা

সব সমস্যা বাবার কাছে উজাড় করে দিতে আসেন ভক্তরা, লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রতিনিয়ত তার তুলনাহীন সীমাহীন বাবার মাহাত্ম্য ও করুণায় আকৃষ্ট। বাবা বিমুখ করেন না কাউকেই।

বহু প্রাচীনকালে হত্যে দেওয়ার বিধি প্রচলিত। মুমূর্ষ কোন রোগীকে বাঁচাতে, দূরারোগ্য কোন ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য বা কোনও কঠিন সমস্যায় পড়ে মানুষ তারকেশ্বরে বাবার পায়ে এসে ধর্না বা হত্যে দেন।

এই হত্যোদানের নিয়ম বিধি আছে। হত্যে দেওয়ার আগের দিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করে শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। হত্যে দেওয়ার দিন তারকেশ্বর ধামে এসে ক্ষৌর হয়ে গঙ্গা মাটি গায়ে মেখে বাবার পূজা দিতে হয় এবং মনস্কামনা নিবেদন করতে হয়। ভোগের পর পূজার প্রসাদ ইত্যাদি সহ আতপ চাল ও দুধ দিয়ে চরু রান্না করে খেতে হয়। বিকেল ৫টার পর আবার দুধ পুকুরে স্নান করে বাবার গদিতে নাম লিখিয়ে তারকনাথ দর্শন করে হত্যে দিতে হয়। মন্দিরের সামনে সিক্ত বস্ত্রে নতজানু লম্বিত হয়ে মাটিতে পরে প্রণাম দিতে দিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে হয়— দিবা রাত্র ধ্যান করে বাবাকে মনস্কামনা জানাতে হয়। বাবার করুণা ভিক্ষা করতে হয়। প্রথম ৩ দিন কোনও রূপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে নেই। অশক্ত হয়ে পড়লে চরণামৃত পান করতে পারেন। একটি নতুন কাপড় ও গামছা এবং একটি কম্বল নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখা দরকার। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে অবশ্যই বাবার প্রত্যাদেশ মেলে। আদেশ পাওয়ার পরদিন ভালভাবে পূজা দিয়ে ধর্না ভঙ্গ করতে হয়। ভক্তদের সাহায্য করার জন্য পান্ডারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

শ্রী তারকনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্থানীয় মতে প্রচলিত কাহিনি

রাজা ভারামল্লার বিশাল গোশালার শ্রেষ্ঠ ধন কপিলা গাভীর দুধ ছিল সবচেয়ে বেশি—তাই এই অঞ্চলের সকলের ঈর্ষার বস্তু। হঠাৎ সেই গাভীর কপিলার দুধ এত কমে গেল — প্রধান গোরক্ষক মুকুন্দ ঘোষ চিন্তায় আকুল। কথাটা রাজার কানে উঠতেই, তিনি তৎক্ষণাৎ মুকুন্দ ঘোষকে আদেশ দিলেন

যেমন করে হউক শীঘ্র এর কারণ অনুসন্ধান করতে।

অনেক অনুসন্ধানে ও জিজ্ঞাসা করেও কোন কারণ জানতে পারলেন না। তখন মুকুন্দ ঘোষ গাভীটিকে ছেড়ে দিয়ে --- তার অনুসরণ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন গাভীটি জঙ্গলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায়। কাছে গিয়ে মুকুন্দ ঘোষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন কপিলা একটি শিলাখণ্ডকে মাঝখানে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার স্তন থেকে অঝোরে ঝড়ে পড়ছে ঘন দুধের ধারা। মুকুন্দ এগিয়ে গিয়ে দেখলেন — শিলা খণ্ডটির গড়ন শিবলিঙ্গের মতো। মাঝখানে একটি গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে কপিলার দুধ কোথায় চলে যাচ্ছে। কোথাও উপচে পড়ছে শিলাখণ্ডটির গা বেয়ে। আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হয়ে মুকুন্দ ঘোষ খবর দিলেন রাজা ভারামল্লকে। পরদিন রাজা স্বয়ং জঙ্গলে গিয়ে দেখলেন সেই অপূর্ব দৃশ্য। ফিরে এসে আদেশ দিলেন শিলাখণ্ডটি তুলে নিয়ে আসতে। মনোবাসনা তাকে রামগড়েই প্রতিষ্ঠিত করবেন।

কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বার দিন মাটি খুঁড়েও সেই শিলার তল পেলেন না — রামগড়ের রাজ কর্মচারীরা। কোথায় এর মূল? কালঘাম ছুটে গেল তাদের — ছড়া আছে

শতকোড়া দিল রাজা কাটিবারে মাটি

যত খোঁড়ে তত বাড়ে পুষ্করাণীর মাটি।

বার দিন খোঁড়ে তবু অন্ত নাহি পায়

যতই খোঁড়ে ততই বাবা পাতাল পানে ধায়।

ভক্ত দুঃখ পান তিনি ভাবিয়া অন্তরে

নিশিযোগে বসেন গিয়া রাজার শিয়রে।

বাবা তারকনাথ রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন আমি তারকেশ্বর শিব গয়া

গঙ্গা কাশী পর্যন্ত আমার বিস্তার — "গয়া গঙ্গা বারাণসী ব্যাপ্ত মোর মূল"। তুমি আমাকে তুলিবে কি করে। তুমি এখানেই "তারকেশ্বর মন্দির" নির্মাণ করে দাও। এরপর রাজা বিষ্ণুদাস ও রাও ভারামল্লা দুই ভাই তারকেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন।

মোহন্ত মহারাজ আদি ইতিহাস

এবার দেখা যাক এই কথিত কাহিনির পূর্ব ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেশব হাজারি নামে এক রাজপুত্র বৃদ্ধ বয়সে পুত্র কন্যা সহ কানা নদীর তীরে রামনগরে আসে — সুদূর অযোধ্যা থেকে মুসলমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে। কেশব হাজারির দুই পুত্র বিষ্ণু দাস ও ভারামল্ল এবং কন্যা ভানুমতি। স্থানীয় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন — ক্রমে ক্রমে রামনগরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে জমিদারী চালাতে লাগলেন— বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লা দুই ভাই। নবাব খবর পেয়ে তাদেরকে বন্দি করে আনেন। বৃদ্ধ হাজারিকে ছেড়ে দিলেন এবং দুই ছেলেকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

বিষ্ণুদাস বিষ্ণুর উপাসক। কারাগারে যবনদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করলেন না। এ সংবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কৌতুহলী হলেন। নবাব আদিতে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাসের ভক্তি পরীক্ষার জন্য তার হাতে একটি উত্তপ্ত লৌহ শলকা নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। ভক্ত বিষ্ণুদাস সেই উত্তপ্ত লৌহ শলকা দুই হস্তে ধারণ করেন। নবাব সন্তুষ্ট হয়ে দুই ভাইকে মুক্তি দেন এবং দুই জনকে নালিগড়ে ও মোহনবাগ পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। সেই সঙ্গে বিষ্ণুদাসকে রাজা এবং ভারামল্লাকে রাও উপাধিতে ভূষিতে করেন। ভারামল্ল রামনগরে ও বিষ্ণুদাস বহিরাগড়ায় বসতি স্থাপন করেন।

কপিলা গাভীর কাহিনি, মন্দির নির্মাণ করেন ২৩ বিঘা জমির উপর। মুকুন্দ ঘোষকে সেবার ভার দেন। তারকেশ্বরে আদি মোহন্ত নিযুক্ত হয় মোহন্ত মায়াগিরি।

মায়াগিরির একটা ইতিহাস আছে। তারকেশ্বরে তারকনাথের আবির্ভাব সম্পর্কে তারকেশ্বর লীলা তত্ত্ব-এর উল্লেখ আছে। উত্তরাখণ্ডের যোশী মঠ মহন্ত নিষ্প্রাণ গিরি তাঁর শিষ্য মায়াগিরি কে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি রাও ভারামল্লর রাজধানী রামনগরের ৩ মাইল দূরবর্তী গভীর জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম স্থাপন করেন। সঙ্গে ছিল তার শিষ্য মুকুন্দ রায় গিরি আর একটি ত্রিপদ অশ্ব।

মায়াগিরি দিনের বেলায় গুরুর আদেশে লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে শৈব ধর্ম প্রচার করতেন আর রাত্রে গভীর জঙ্গলে বসে সাধনা করতেন। কথাটা রাও ভারামল্লার কানে গিয়ে পৌঁছতেই, তিনি রাজ কর্মচারী পাঠিয়ে তাদের দুইজনকে ধরে আনবার নির্দেশ দিলেন। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্ন্যাসীদ্বয়ের সন্ধান পেলেন না। তখন রাজা নিজেই সৈন্যদল নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর রাজা তাদের সাক্ষাৎ পেলেন।

রাজা ভারামল্ল দেখলেন জঙ্গলের একটু পরিষ্কার জায়গায় দুইজন সন্ন্যাসী একটি ত্রিপদ অশ্বের পরিচর্য্যা করছেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাজা তাদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাস করলেন "আপনারা কে? এই গভীর জঙ্গলে বাস করছেন কেন? আর কেন তিন-পায়ে জন্তুটির পরিচর্য্যা করছেন?" মায়াগিরি বললেন আমরা সন্ন্যাসী। এই জঙ্গলে সাধনা করি। আর ত্রিপদ অশ্বটি আমার বাহন। সন্ন্যাসীর উত্তরে রাও ভারামল্ল হেসে উঠলেন। আপনারা অনাদি লিঙ্গ সাধনা করতে পারেন, কিন্তু এই তিন পায়ে অশ্ব বাহন, হয় কি করে? মায়াগিরি হেসে বললেন মহাদেবের অপার করুণায় সবই সম্ভব। রাও ভারামল্ল বললেন আপনি যদি আপনার এই বাহনে চড়ে ঘুরে আসতে পারেন, তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেব। তা না হলে উপযুক্ত শাস্তি পাবেন।

মায়াগিরি হেসে তার শিষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। মুকুন্দগিরি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলেন আর ত্রিপদ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মায়াগিরি তার পিঠে আরোহণ করলেন। অশ্বটি তীব্র বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুপরে একই গতিতে ঐ অশ্বপিঠে তিনি ফিরে এলেন।

মায়াগিরি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতেই ঘোড়াটি আবার মৃত হয়ে পড়ে রইল আর মুকুন্দগিরি ওঠে দাঁড়ালেন। রাজা ভারামল্ল এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হলেন এবং সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সন্ন্যাসীও প্রীত হয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এক অপূর্ব শিলা মূর্তি দর্শন করালেন। বললেন এই মূর্তিই তার আরাধ্য দেবতা। ত্রাণ কর্তা মহেশ্বর রাঢ়দেশে অবতীর্ণ শ্রী তারকেশ্বর।

সন্ন্যাসী মায়াগিরির কাছেই রাজা ভারামল্ল জানতে পারলেন যে রাজার অতিপ্রিয় কপিলা গাভীটি জঙ্গলে এসে এই শিলা মূর্তির উপরেই দুগ্ধ ক্ষরণ করত। রাজা ভারামল্ল সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করলেন। তার সমস্ত সম্পত্তি দেব সেবায় উৎসর্গ করেন।

তারকেশ্বরের আদি মোহন্ত এই মায়াগিরি, তিনি দশনামী শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত। এই দশনামী শৈব সম্প্রদায় এখানে কি ভাবে এলেন?

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির মসনদ নিয়ে প্রচন্ড মারামারি হানাহানি শুরু হয়। সারাদেশে অরাজকতা। সেই দুর্যোগের সুযোগে দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীরা চর্তুদিকে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করতে লাগলেন।

দশনামী শৈব সম্প্রদায় জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী। গুপ্তযুগের পর ব্রাহ্মন্যবাদ নানা অনাচার অবিচার পূর্ণ হয়ে উঠল। তারা তাদের আপন অধিকার হারালেন। এই সময় ইসলাম ধর্ম সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করল। নিম্নবর্গের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম আদর্শে আকৃষ্ট হল।

এই পরিস্থিতিতে আদি গুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে শঙ্করাচার্য্য তার অদ্বৈতবাদ প্রসারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারটি মঠ স্থাপন করেন। দ্বারকায় কালকা মঠ। এখানে তিনি আচার্য্য নিয়োগ করেন হস্তামলককে। পুরীতে গোবর্ধন মঠ, এখানে আচার্য্য পদ্মপাদ। বদরীকাশ্রমে শ্রীমঠ, এখানে আচার্য্য তোটকাচার্য্য। এবং দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ এখানে আচার্য্য মন্ডন।

আচার্য্য পদ্মপাদের শিষ্যরা, তীর্থ ও আশ্রম, হস্তামলকের দুই শিষ্য সম্প্রদায়

বন ও অরণ্য, তোটকাচার্য্যের তিন শিষ্য সম্প্রদায় গিরি, পর্বত ও সাগর এবং মণ্ডনাচার্য্যের তিন শিষ্য সম্প্রদায় সরস্বতী, ভারবে ও পুরী নামে পরিচিতি ছিলেন। এই চার মঠাধীশের দশ শিষ্য সম্প্রদায় থেকে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় উদ্ভুত হয়েছে। তারকেশ্বরের আদি মহন্ত মায়াগিরি বদরিকাশ্রমের তোটকাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায়। তারকেশ্বরের আদি মোহন্ত মায়াগিরির ৫৬৫ জন শিষ্য ছিলেন। তিনি কুড়ি বছর মোহন্ত পদে ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শিষ্যদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে যান। তারপর তাঁর প্রধান শিষ্য অমরনাথ গিরি তারকেশ্বর মন্দিরের মোহন্ত হন। তিনিও প্রায় ত্রিশ বছর মোহন্ত পদে ছিলেন। এরপর মোহন্ত হন কেশবচন্দ্র গিরি, জওয়াহার গিরি, ব্রজেন্দ্রলাল গিরি, কোপালনাথ গিরি, মুকুন্দনাথ গিরি, বালকৃষ্ণ গিরি প্রমুখ। এই সময় বর্ধমানের রাজা ও নবাবের সঙ্গে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ বাধে। সেজন্য প্রায় তিনশো বছর কোনও মোহন্তর পরিচিতি পাওয়া যায় নাই। যাদের নাম জানা গেছে তারা হলেন গৌরনাথ গিরি, নির্মল নাথ গিরি, যজ্ঞেশ্বর গিরি, বলভদ্র গিরি, শ্যামল নাথ গিরি, সমুদ্র গিরি, অরুণাচল গিরি, প্রসাদ গিরি, পরশুরাম গিরি, রঘুচরণ গিরি প্রমুখ। বিগত এই সময়ের মধ্যে তারকেশ্বর মন্দিরের অনেক উত্থান পতন ঘটে। তারকেশ্বরে যেমন বহু সদাচারী নিষ্ঠাবান মোহন্তের সাক্ষাৎ মিলে তেমনি সময় সময় ব্যাভিচারী মোহন্তের আবির্ভাব ঘটে। রাও ভারামল্লা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তারকেশ্বরের মোহন্তরা হবেন দশনামী সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী হিসাবে দেব সেবা করবেন। তারা বিয়ে করতে পারবেন না, সংসার করতে পারবেন না। একজন মোহন্তের মৃত্যুর পর তার প্রধান শিষ্য মোহন্ত হবেন।

তারকেশ্বর মঠে মোহন্ত হিসাবে সমুদ্রগিরির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময় মঠের অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। তখন তিনি মঠ সংস্কার করেন এবং বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেন।

আচার্য পরম্পরায় রঘুচরণ গিরির পর মোহন্ত হন তার শিষ্য মাধব চন্দ্র গিরি। এই মাধবচন্দ্র গিরি ছিলেন একজন ব্যভিচারী মোহন্ত। তারকেশ্বরের কাছে কুমভুল নামে এক গ্রামে নীল কমল মুখোপাধ্যায় থাকতেন। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বড় মেয়ে এলোকেশী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী যুবতি। একে দেখে মোহন্ত মাধব

গিরি প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। নীল কমল বাবুর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এলোকেশীকে পাওয়ার জন্য মাধব গিরি নীলকমলের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দূত হিসাবে কাজে লাগায়। তার সহযোগিতায় এলোকেশীকে মাদক সেবন করিয়ে নিজের ঘবে এনে তার সতীত্ব নাশ করেন। এলোকেশী ছিল বিবাহিতা। তার স্বামী নবীনচন্দ্র মাধব গিরির লালসা থেকে বাঁচাতে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু মাধবগিরি তাদের পালানোর সব পথ বন্ধ করে দেয়। তখন নবীন চন্দ্র কোন উপায় না দেখে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে আত্মসমর্পণ করে, এবং মাধব গিরির নামে অভিযোগ দায়ের করে। নবীন চন্দ্রের যাবজ্জীবন জেল হয়, মাধব গিরির জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে মাধব গিরি ফের মোহন্তের পদ অধিকার করে।

মাধবগিরির মৃত্যুর পর মোহন্ত হন সতীশচন্দ্র গিরি। এর সময় তারকেশ্বর জমিদারীর বিপুল উন্নতি হয়। তার সময়ে বহু রাস্তা ঘাট ও তৈরি হয়। তিনি গুরুর দোষে দুষ্ট ছিলেন। তার কাজকর্মের তেমন কোন সুনাম নাই। এরপর স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দের নেতৃত্বে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ চন্দ্রের সহায়তায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। মোহন্ত সতীশ গিরি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তারকেশ্বর এস্টেট সরকারের হাতে চলে যায়। বাবু অমূল্য চরণ চৌধুরী তারকেশ্বর মঠে রিসিভার নিযুক্ত হন।

এরপর আদালতের নির্দেশে তারকেশ্বর মঠের মোহন্ত হয়ে আসেন দন্ড স্বামী জগন্নাথ আশ্রম। জমিদারী পরিচালনার জন্য কমিটি গঠিত হয়। মোহন্ত জগন্নাথ আশ্রম একজন সদাচারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তার চেষ্টায় তারকেশ্বরে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর তার প্রিয় দন্ড স্বামী ঋষীকেষ আশ্রমকে মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত করে তিনি কাঁকো চলে জান। দন্ডস্বামী ঋষীকেষ আশ্রম ভূতপূর্ব মোহন্ত মহারাজের স্থাপিত বিদ্যালয়ে নৈষ্ঠিক ও আচারবান কৃতী বিদ্যার্থী। বর্তমানে ইনিই তারকেশ্বর মঠের মোহন্ত মহারাজ।

উল্লেখ্য এই সব তথ্য ও কাহিনির সমর্থন রয়েছে বিখ্যাত "তারকেশ্বর লীলাতত্ত্ব" গ্রন্থে।

শ্রী কপিল মণ্ডলের আশ্রমে এক নতুন অভিজ্ঞতা

১৩ই জানুয়ারি ২০০৪ সাল রবিবার - আমাদের ত্রিপুরা লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এর বার্ষিক সম্মেলন হবে। এবার অনেক দূরে আমাদের এখান থেকে প্রায় ৫০ কি.মি দূরে- লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ৫ কিলোমিটার।

আমরা জনা ১৫ অনুপমা কমপ্লেক্স থেকে ভোর ৭টায় টেক্সি করে শিয়ালদাহ সাউথ স্টেশনে যাই। বিশাল লাইন টিকিটের জন্য, আমি আমার সহকর্মী ডাঃ মজুমদারকে আমার ও স্ত্রীর টিকিট করার জন্য অনুরোধ জানাই। যথা সময়ে আরো অনেকে বিরাটী ও অন্যান্য জায়গা থেকে এসে পৌঁছেছে। টিকিট করার পর আমরা প্ল্যাটফর্ম-এর দিকে অগ্রসর হই। যথেষ্ট ভীড়, সেদিন অবশ্য সি পি এম-এর ডাকে মহামিছিল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ। ট্রেন ছিল ৮.২০ মিনিটে। ট্রেনে উঠে অবশ্য সিট নিতে পেরেছি। কিন্তু অসম্ভব ভীড় বেশ কষ্ট করেই ঘণ্টা খানেক কাটাতে হয়েছে। ১০টা নাগাদ লক্ষ্মীকান্তপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাই। তারপর আশ্রমের লোকজনকে খুঁজে পাই। তাদের তত্ত্বাবধানে অটো করে গন্তব্যস্থলে চলে যাই। চারিদিকে বিস্তীর্ণ আবাদি জমি। মাঝে গাছপালা নিয়ে ছোট ছোট বসতি রয়েছে। আমরা পৌঁছে যাই সেই বিরাট সংস্থার শেষ প্রান্তে। বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ও শিশু উদ্যান চত্বরের শেষ প্রান্তে রয়েছে রন্ধনশালা অন্য দিকে স্টোর মাঝে খোলা জায়গায় চেয়ার সাজানো রয়েছে আমাদের প্রাতঃরাশের জন্য। অবশ্য সামনে বাঁদিকে রয়েছে ভোজন কক্ষ — সেখানেই ব্যবস্থা হয়েছে প্রাতঃরাশের।

প্রাতঃরাশ সেরে আমরা সেবাশ্রমের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রথমে সাক্ষাৎ করি এই সংস্থার প্রাণ পুরুষ কপিল মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি এখানকার কাজকর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য দেন আমাদের। সেবাশ্রমটি আয়তনে ৫০০x২০০ ফুট, চারিদিকে রয়েছে — দু-তলা, তিন তলা দালান, সেবাশ্রমের

অফিস ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজকর্ম হয়। তা ছাড়া রয়েছে একটি সংগ্রহশালা আর রয়েছে আগামী দিনে এই সংস্থার কাজকর্মের পরিকল্পনা। প্রায় ১০০ একর জায়গা নিয়ে এই সংস্থা। এতে যেমন রয়েছে চাষের জমি — তেমনি রয়েছে মাছ চাষের জন্য জলাশয়। মূল রাস্তা থেকে সেবাশ্রমের দূরত্ব প্রায় ২.৫ কিলোমিটার। পথে ডান দিকে সোসাল ওয়েলফেয়ার-এর গ্রামীণ অর্থনীতির কাজকর্মের দপ্তর। তারপর মূল রাস্তার কাছে— ডানদিকে রয়েছে "আকাশ নিলয়"। অনাথ আশ্রম তিনতলা বিল্ডিং তাতে রয়েছে সভাকক্ষ দোতালার একদিকে আর এক দিকে ভোজন কক্ষ। এছাড়া দোতালার সামনে উন্মুক্ত বসার জায়গা — যেখানে সভা সমিতি করার ব্যবস্থা রয়েছে, সমস্ত কিছুই নিঁখুত ও সুশৃঙ্খল।

আমরা সেবাশ্রম ও শিশু উদ্যান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। উদ্যানে রয়েছে বিভিন্ন রকমারী ফুলের সম্ভার। সেবাশ্রমের প্রবেশ পথ দিয়ে রাস্তা—গিয়ে শেষ হয় সেই ছোট্ট পুকুরে। দুই পাশে রয়েছে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাস—ও লতাপাতার বাহার। সব কিছু মিলে এক অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মনটা আনন্দে ভরে যায়। প্রাতঃরাশ সেরে আমরা প্রায় ২ কিমি. দূরে "আকাশ নিলয়ে" যাই। সংস্থার রিক্সা, ভ্যান রয়েছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা ৫/৬ জন করে ভ্যান রিক্সায় "আকাশ নিলয়" অনাথ আশ্রমে যাই। যাওয়ার পথে ২/৩টি কৃষক পরিবার, মনে হল এই সংস্থারই আশ্রিত। সদ্য ক্ষেত থেকে আনা ধানের ভাঁড় স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। ধানের মাড়াইও চলছে। ২/১টি আশ্রিত মৎস্যজীবী পরিবারও রয়েছে, যারা জলাশয়গুলিতে মাছের চাষ করছে। এসব কর্মকাণ্ড দেখে বিস্মিত হযে যেতে হয়। খবর নিয়ে জানলাম মন্ডলবাবু কিছু গ্রামের ছেলেদের নিয়ে এই কাজ শুরু করেন। সুন্দর বনের এই অঞ্চলে, লোকজনের বসতি ও তেমন গড়ে উঠেনি, মন্ডলবাবু গ্রামে প্রথম ক্লাবের ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করেন— সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে। কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট সুনাম ও গ্রামবাসীর বিশ্বাস অর্জন করে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে কাজে লেগে পড়েন। নিজের প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আর কর্ম ক্ষমতা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আজ দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর কাজ করছেন। পথে রিক্সা ভ্যান করে আসবার সময় একটি চিনা মেয়ের

সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করছে অপর দিকে হাতে কলমে নিজেকে গ্রামের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রাখছে।

রিক্সা ভ্যান করে আসতে পথে মন্ডলবাবুর আস্তানা দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। এর সহজ সরল জীবন — বাসস্থানটি না দেখলে অনুমান করা কষ্টকর। একটি ছোট্ট মাটির ঘর, স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন। তিনি একটি আটপৌরে শাড়ি পরে, আমাদেরকে সম্ভাষণ করলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সমস্ত বাড়িটা। খড়ের ছানি দেওয়া মাটির ঘরের একটি কোঠায় মন্ডল বাবু থাকেন। সমস্ত বাড়িটায় রয়েছে ফুলের মেলা। এই ফুল গাছের সেবা যত্ন মণ্ডল বাবু নিজে করেন। প্রাচুর্য বলতে ফুলের প্রাচুর্য ছাড়া কিছু নেই; যা এই বাসস্থানের দীনতা ছাপিয়ে দর্শকের মনে এক অনাবিল আনন্দ এনে দেয়।

এক অসাধারণ মানুষ। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী জানাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। লেখক চাণক্য সেনের এক নিবন্ধ থেকে এই মানুষটির অনেক খবর জানতে পারি।

১৯৭৮-৭৯ সাল চাণক্য সেন তখন কলিকাতায় থাকতেন বালিগঞ্জের ঢাকুরিয়া রোডে। বাড়ির টেলিফোন লাইন বিগড়ে গেছে লাইন ম্যানকে ধরতে হল। এক সময় লাইন ম্যান বলল আমার একটি ছেলে আছে, সবে মাধ্যমিক পাশ করেছে। তার একটা চাকুরি? বললাম নিয়ে আসুন ছেলেটিকে দেখিতো! দুদিন পরেই একটি সরল সুবোধ পরম সুশীল অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক আমার পদধূলি নিয়ে মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা মহাদেব মন্ডল বললেন এই আমার ছেলে কপিল। ধূতি পাঞ্জাবী পরা লাজুক সপ্রতিভ ছেলেটির মুখে কথা সরেনা। কথা বার্তায় জানতে পারলাম।

মাধ্যমিক পাশ করেছে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পড়বে না। বাবার ইচ্ছে চাকুরি করা। চাকুরি পেলে টাইপ শিক্ষার ইচ্ছা আছে। কপিল মন্ডলকে একটি প্রকাশনী সংস্থায় অফিস বয় পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিলাম।

যে গ্রামে কপিল মন্ডলের বাস তার নাম উল্লোন। নিকটতম স্টেশন

লক্ষ্মীকান্তপুর, থানার নাম মন্দির বাজার। জিলা- দঃ চব্বিশ পরগনা। চাকুরি পেয়েই টাইপ রাইটিং স্কুলে ভর্তি হয়। সকাল ছয়টায় ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হেঁটে ৯টা নাগাদ অফিসে আসত মধ্য কলকাতায়। বাড়ি ফিরতে রাত ১০টা বেজে যেত।

একদিন হঠাৎ তিনি আমার সামনে হাজির একটা অনুরোধ নিয়ে।

"স্যার আমরা গ্রামে একটা ক্লাব তৈরি করেছি। খেলাধুলার ক্লাব। ফুটবল নিয়ে শুরু। আপনি আসবেন দেখতে?"

সস্ত্রীক চাণক্য বাবু চলে গেলেন উল্লোনে। কপিল মন্ডলের বাড়ি মাটির দেওয়াল, ছাদ টিনের, তিন খানা বড় বড় ঘর, আলাদা রান্না ঘর, বাড়ির সামনে চারিদিক উন্মুক্ত, ভেতরে অনেক গাছ, পিছনে বড় পুকুর স্বচ্ছ জল।

কপিল মন্ডলের বাবা দরিদ্র গ্রামবাসী নন। জমি জমা আছে, গ্রামীণ মধ্য বিত্ত।

বাংলাদেশ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয়েছে প্রধানত উঃ চব্বিশ পরগনায়। সামান্য কিছু বাসস্থান হয়েছে দঃ চব্বিশ পরগনায় সাগরদ্বীপ সুন্দরবন অঞ্চলে। অতএব বেসরকারি উদ্যোগে কৃষি ও সামাজিক উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

উল্লোন এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার। মুসলিম প্রধান গ্রাম। কপিল আমাকে তার গ্রামে নিয়ে যায়। আমি স্তম্ভিত। রাস্তা নেই, পানীয় জল নেই, গাছ নেই, হতশ্রী মাটির বাড়ি আর ধুলো।

কপিল মন্ডল চুনফুলি গ্রামে প্রথম প্রাক্ প্রাথমিক স্কুল তৈরি করে।

লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে ৫ কি.মি. দূরে কপিল আমাদের প্রথম নিয়ে গেল তার "বিবেকানন্দ যুব সংঘ"। নড়বড়ে ছোট ঘর হোগলার ছাউনি। ৭/৮টি যুবক ছেলে এবং একটি ড্রাম। এই ক্লাব গ্রামের ছেলেদের নিয়ে ফুটবল কবাডি খেলে আর একটু আধটু সেবা করে গ্রামবাসীদের যেমন মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে

দাহ করানো। অসুস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।

এই থেকে শুরু করে কপিলানন্দ মন্ডলের উদ্যোগে অক্লান্ত পরিশ্রমে এখানে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বেসরকারি এন জি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ঠিকানা ঃ থানা মন্দির বাজার, রায়লোচন পুর, লক্ষ্মীকান্তপুর রেল স্টেশন। গ্রামীণ শহর কুলপি ১৪ কিমি. দূরত্বে।

কপিলানন্দের বয়স এখন ৫০। লেখক চাণক্য সেন এই লোকটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছেন যদি আপনি কপিলের মুখ ও চোখের উপর সন্ধানী দৃষ্টি স্থাপন করেন, দেখবেন এখনও স্তরের পর স্তর রয়েছে সাজানো স্বপ্ন, দুঃসাহস ও অসাধ্য সাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রশস্ত ললাটে অকপট বিশ্বস্ততার সঙ্গে অবিমিশ্র সততা।

কপিলামন্ডল এখন বিশ্ব বিখ্যাত। অনেক দেশ ওকে ডেকে নিয়েছে, অনেক বিদেশিরা বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের বিশাল ভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন, একেবারে নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা কিছুটা দখল অর্জন করেছে। বিভিন্ন দেশে বহু সেমিনারে আমন্ত্রিত। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত — ভারত সরকারের আমলা, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান থেকে সমাগত উৎসুক্য মানুষ, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত দরিদ্র মধ্যবিত্ত পুরুষ মহিলা।

গ্রামে জন্ম নিয়ে একটানা গ্রামে বাস করে, কপিলানন্দ মন্ডলের কর্মকান্ড এক দীর্ঘ ২৫ বছরের ধারাবাহিক বিস্ময়, আমি চাণক্য সেন অভিভূত।

কপিলানন্দের বাসস্থানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রিক্সাভ্যান করে 'আকাশ নিলয়' পৌঁছে যাই। ১২টা নাগাদ সভা করে আমাদের ত্রিপুরা লাভার্সের গান বাজনার অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সভাপতি দীপক কুমার চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে, ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে সভার কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথমে আমি স্বাগত ভাষণে সবাইকে অভিনন্দন জানাই। এখানকার কর্মকান্ড ও ব্যবস্থাপনা এত সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও অর্থ বহ আমরা সবাই অভিভূত। জানাই কর্ম কর্তাদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তারপর নাচ গান আবৃত্তি চলে ২টা পর্যন্ত। নাচ গান পরিচালনায় শ্যামা

প্রসাদ চক্রবর্তী। ত্রিপুরা লাভার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন কোষাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার দাশ। গুণীজন সম্বর্ধনায় আমন্ত্রিত হয়ে আগরতলা থেকে এসেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অমিত ভৌমিক। এই অনুষ্ঠানে পুষ্প স্তবক ও স্মৃতিফলক দিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়।

পাশে ভোজন কক্ষে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা। সুন্দর ব্যবস্থাপনায়, সবাই বসে গেলাম ফ্লোরে—বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা যত্ন সহকারে পরিবেশন করে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। এই পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধানত অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। এই পান্ডব বর্জিত সুন্দর বন এলাকার এই ছাত্র ছাত্রীদের অনুষ্ঠান দেখে আমরা মুগ্ধ অভিভূত। নাচ গান আবৃত্তি যোগাসন মাঝে মাঝে দিদিমণিদের গান ও আবৃত্তি। সব মিলে অপূর্ব, আমরা মোহিত। এই পর্বে অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বর্ণালী মন্ডল ও সুমন দেব। বার্ষিক সম্মেলনের কর্মসূচিতে ছিল ত্রিপুরা লাভার্সের ইনফরমেশন ডাইরেক্টরি এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন কপিলানন্দ মন্ডলের "গুরু মা"। তিনি বারাসাত কালীমন্দিরে থাকেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এখানে এসেছেন। তারপর সেক্রেটারী শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী উপস্থিত মেম্বারদের মধ্যে ডাইরেক্টরী বিতরণ করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণার পর আমরা গুরুমার হাতে ৭৫০০ টাকার একটি তোড়া আশ্রমের সেবায় অনুদান দেই। উল্লেখ্য এখানে আমরা বার্ষিক অনুষ্ঠান করছি। প্রাতঃরাশ থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া ও অনুষ্ঠানের মাইক সমস্ত খরচ সংস্থা বহন করেছেন।

বিদায় নিতে গিয়ে বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ও শিশু উদ্যানের সহ সভাপতি বিরাট হালদার এই সংস্থার আরেক কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের কাছে তুলে ধরলেন — **ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।**

প্রথমে আমাদের একটা ক্লাব ছিল। এর মাধ্যমেই বিভিন্ন রকম কাজে, যেমন চক্ষু শিবির, রক্তদান, গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ার বই প্রদান এগুলো করা

হত। তারপর বৃক্ষ রোপণ, রাস্তা মেরামত এইসব কাজগুলো করা হত। এগুলো করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারটা দাদার মাথায় আসে। কপিলবাবু একদিন একটা ভ্যান রিক্সায় যাচ্ছিলেন। ঐ রিক্সা চালকের কাছে জানলেন রিক্সা চালিয়ে তাকে প্রতিদিন ৫ টাকা রিক্সার মালিককে দিতে হয়। তখনই তিনি রিক্সাওয়ালাকে একটা প্রস্তাব দিলেন, তুমি আমাদের কাছ থেকে রিক্সা নাও, এবং এই রকমভাবে প্রতিদিন কিছু টাকা জমা দাও। এইভাবে একটা সময় তোমার টাকা থেকেই তুমি লোন দিতে পারবে এবং এক সময় রিক্সাটাও তোমার হয়ে যাবে। এই ভাবেই শুরু হল ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া।

এই প্রকল্পে ঋণ নিতে গেলে প্রাথমিকভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হবে। একটা বই করতে হবে, যেখানে আপনি ডেইলি, উইকলি, মান্থলি বা এককালীন একটা টাকা রাখতে পারেন। যার উপর ভিত্তি করে আপনাকে ঐ সঞ্চিত টাকার পাঁচগুণ পর্যন্ত লোন দেওয়া হবে। এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু হয় ১৯৯২ সালে। হালদার বাবু জানালেন তিনিও এই প্রকল্পে ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানেও ১ লাখ টাকা আছে। অফসেট বসিয়েছেন একটা কাটিং মেসিনও আছে, মাসে ৫-৬ হাজার টাকা আয় হয়। সবই এই প্রকল্পের জন্য।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প যার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বাংলাদেশের মহঃ ইউনিস ও তার গ্রামীণ ব্যাংক। ভারতে কপিলানন্দ মন্ডল সেই কাজ শুরু করেছেন প্রথম দফায় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় দফায় শুরু হওয়া কাজটি চলছে, সাফল্যের সঙ্গে।

এইসব দেখে শুনে আমরা বিস্মিত, অভিভূত গ্রামের ছেলে কপিল, সারা জীবন গ্রামবাসী। কপিল উচ্চ শিক্ষিত নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ভালবাসা দিয়ে তিনি কি করছেন— না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

একটা সুন্দর দিন, একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম—এ স্মৃতি ভুলবার নয়।

দেবতার ঘর

দেওঘর-বৈদ্যনাথ ধাম

আজ শনিবার ২৫শে ডিসেম্বর — বড়দিন — স্কুল কলেজ বন্ধ। আমরা ৪ জন আমি সস্ত্রীক মেয়ে ও জামাতা সঙ্গে নাতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি — বৈদ্যনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে — ৫ দিনের সফরে। বিকেল ৪টা নাগাদ জসিদি স্টেশনে পৌঁছি। তারপর পৌঁছে যাই অটো করে দেওঘর সুভাষ চৌকে হোটেল বৈদ্যনাথ বিহারে। কলকাতা থেকে টেলিফোনে ৫ জনের একটা রুম বুক করে রাখি। তাই কোন অসুবিধা হয়নি।

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর ভোরে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ি বৈদ্যনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। শহরের মাঝে টাওয়ারের কাছেই। ভারতের তীর্থ স্থানগুলির মধ্যে বৈদ্যনাথ ধামের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে বৈদ্যনাথ ধাম একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কলকাতা থেকে ৩০২ কিমি. দূরে জসিদি স্টেশন থেকে ৬ কিমি. দূরে দেওঘর শহরের মাঝে এই মন্দিরের অবস্থান। এখানে সারা বছরই তীর্থযাত্রীদের ভীড় লেগে আছে। এখানে অনেক মন্দির ও সাধু সন্তের আশ্রম আছে — যেন দেবতাদের ঘর — তাই নাম দেওঘর।

এই মন্দিরের উচ্চতা ৭২ ফুট — তাতে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ... আন্দাজে অনুভব করতে চেষ্টা করলাম — কিন্তু এতো ছোট হওয়ায় ঠিক বুঝতে পারিনি। যথারীতি পান্ডাদের সহায়তায় মন্দিরে ভোগ চড়াই। এই মন্দির চত্বরে আরো অনেক মন্দির রয়েছে। পার্বতী মন্দির, মুখ্য মন্দিরের ঠিক পূর্ব দিকে। এখানে মাতা পার্বতী রয়েছেন বাঁদিকে আর ডানদিকে অসুর বিনাশিনী দুর্গা। তাছাড়া রয়েছে হনুমান মন্দির, গণেশ মন্দির, সূর্য্যমন্দির, তারা মন্দির, সরস্বতী মন্দির ইত্যাদি।

সেখান থেকে ৪ কিমি. দূরে সৎসঙ্গ। দ্বার বন্ধ। ৩টায় খুলবে। প্রসাদ নেওয়ার

জন্য আনন্দ বাজারে ঢুকে পড়ি। তখন সময় দুপুর ১টা। শেষ পর্বে বসে পড়ি। খবর এলো ভাত চড়িয়েছে, আধঘণ্টা পরে ভাত শুধু ডাল সহযোগে আমাদের প্রসাদ গ্রহণ পর্ব শেষ করলাম। খবর নিয়ে জানলাম সব্জি, মিষ্টান্ন শেষ হয়ে গেছে। উল্লেখ এখানে বিনামূল্যে প্রসাদ নেওয়া যায়। তারপর ৩টা নাগাদ সৎসঙ্গ আশ্রমে প্রবেশ করি। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে আশ্রম। আশ্রমেরই পাশে প্রচুর গাছপালা এমনকি বাঁশবনও রয়েছে। মাঝে মাঝে ছোট কুঠুরীতে রয়েছে সাপ, ইঁদুর, হনুমান, বানর, নানা রকমের পাখি। একটি সুন্দর মিউজিয়াম আছে — তাতে রয়েছে ঠাকুরের বাণী ও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি সুসংবদ্ধভাবে সাজানো। এছাড়া রয়েছে ঠাকুরের ব্যবহৃত নলসমেত হুক্কা ও বিভিন্ন সামগ্রী। এই চত্বরে মাঝে মাঝে কিছু ঘরবাড়ি রয়েছে হয়ত ঠাকুর পরিবারের লোকজনের জন্য।

এক জায়গায় দেখলাম একটি বাঁধানো ছোট্ট পুকুর — সুন্দরভাবে সংরক্ষিত— এখানে এক সময় ঠাকুর স্নান করতেন। সৎসঙ্গ আশ্রম দেখতে দেখতে একটা জিনিষ যেটা আমার মনে দাগ কেটেছে — সেটা হল অনুকূল ঠাকুরের বাণী—সমস্ত আশ্রমের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে — পথের দুইপাশে — বাড়ির দেওয়ালে, কাঁটা তারের বেড়ায়, গাছে গাছে জঙ্গলে — কোথায় নই! এই বাণীর বিষয়বস্তুও শুধু ধর্ম বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে সব বিষয়েব উপর ঠাকুরের এই সকল উপদেশ বাণী। এত বাণী আর কোন মহাপুরুষ দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। বাণীগুলি উপভোগ্য ও সুখাপাঠ্য। ঠাকুরের এই উপলব্ধি সঠিক। কলিযুগে ধর্মের চেয়ে যেটা বিশেষ প্রয়োজন — সেটা হল চরিত্র গঠন। তবে সমাজের যে অবক্ষয় চলছে — এ সকল বাণী কতটা সংশোধন আনতে পারবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ঘোড়াগাড়িতে (টানা) হোটেল বৈদ্যনাথ বিহারে ফিরে আসি। ২৭শে ডিসেম্বর ভোরে যথারীতি স্নান প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ি সারাদিনের সফরে। প্রথমে যাই বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। এ আশ্রমের পরিধি কত বড় — তা পরিমাপ করতে পারিনি। এত সুন্দর একটি আশ্রম ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান — সর্বত্রই ফুল — বিশেষ করে রাজগন্ধা

মাঝে মাঝে মন্দির, সরোবর ও বিদ্যালয় রয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম এক বিঘা জায়গা নিয়ে একটা ফুলের বাগান। তার পাশে বাঁধাকপি ও ফুলকপির চাষ। চারিদিকে প্রচুর চাষের জমি রয়েছে—ধান মাড়াইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম বিশাল এক সরোবর—নর্মদা নহওর। এর এক পাড়ে রয়েছে স্ফটিক সয়ম্ভূলিঙ্গ। এটা পাওয়া যায় সাহেব গঞ্জের কাছে এক পাহাড়ে। এই লিঙ্গের স্থাপন হয় বাংলা ১৩৩৬ সাল। এই নহওর এর আর এক পাশে রয়েছে ধ্যান কুটি। এই কুটিরের ভিতর শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর চরণ পাদুকা রাখা আছে, যার উপর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অঙ্কিত আছে। বালানন্দ আশ্রমে প্রবেশের পর প্রথমে পড়ে বালানন্দ আশ্রমের অফিস, তারপর মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর সুসজ্জিত মন্দির। চারিদিকে ফুল আর ফুল — ফুলের মেলা — যা শুধু আকর্ষণীয়ই নয় — একটা স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে — এই নশ্বর পৃথিবীতে। সেখান থেকে যাই রামকৃষ্ণ আশ্রমে। আশ্রম বন্ধ — খুলবে ৩টায়। তাই আমরা নন্দন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হই। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয় — সেখানে রয়েছে কিছু মূর্তি — হর, পার্বতী, হনুমান, সাপ ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে শিশুদের আনন্দ বিনোদনের জন্য প্রচুর সরঞ্জাম। তার পাশেই রয়েছে মন্দির — কালী, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি। এটা পাহাড়ের উপর শিশুদের সুন্দর পার্ক। একটা ছোট ইতিহাস আছে — এই নন্দন পাহাড়ের। অনেকে বলে যে কৈলাস পর্বতে রাবণ বলপূর্বক শিবধামে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। দ্বারপাল নন্দী রাবণকে বাধা দেওয়ায় রাবণ তাকে উঠিয়ে হাওয়ায় ছুঁড়ে দেয়। নন্দী এই পাহাড়ে এসে পড়ে। তাই এটা নন্দন পাহাড় বলে পরিচিত। সেখান থেকে ৩টা নাগাদ যাই রামকৃষ্ণ মিশনে। আশ্রমের মূল মন্দির দর্শন করি। রাস্তার অপর পার্শ্বে রয়েছে দেওঘর রামকৃষ্ণ স্কুল। স্কুলের পরিবেশ খুবই সুন্দর — ছাত্রদের জন্য রয়েছে তিনটি খেলার মাঠ—যা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।

ফেরার পথে আমরা যাই দেওঘর হিন্দি বিদ্যাপীঠে। হিন্দি সাহিত্য জগতে এর বিশেষ অবদান রয়েছে। অনেক লেখক ও হিন্দি সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে — এই বিদ্যাপীঠের কল্যাণে। তাছাড়া প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই সংস্থার প্রধান কূলপতি ছিলেন। এই সংস্থাকে রাষ্ট্রীয় গৌরব প্রদান করার মূলে সাহিত্যিক

সর্বশ্রী জনার্দন প্রসাদ ঝা, প্রফুল্ল পাটনায়ক, শিবদাস সিংহ চৌহান, ঠাকুর প্রসাদ সিংহ, 'সুধাংশু', বুদ্ধিনাথ ঝা, গঙ্গা শরণ সিংহ এবং শিবরাম ঝা-এঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

এরপর পথে শিবগঙ্গা ও মানস সরোবর দেখে নেই। মোগল সম্রাট আকবর, সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বাংলার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ থামাবার জন্য রাজা মান সিংহ সাঁওতাল পরগনায় আসেন। এখানে তিনি নিজের নামে এই সরোবর খনন করেন। সন্ধ্যায় হোটেল বৈদ্যনাথ বিহারে ফিরে আসি — দিনের সফর শেষে।

২৮শে ডিসেম্বর আমাদের আজকের ভ্রমণ সূচিতে রয়েছে — (১) ত্রিকূটাচল পাহাড় (২) তপোবন (৩) জগৎবন্ধু মন্দির ও চন্ডী পাহাড় (৪) কুন্ডেশ্বরী মন্দির (৫) হরিলাজোড়ি।

ত্রিকুট পাহাড় দেওঘর থেকে ১৮ কিমি. দূরে। উপরে উঠবার সিঁড়ি রয়েছে — অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর শীতল জলের ঝর্ণা রয়েছে — যার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। সেখানে মহর্ষি দয়ানন্দ এর আশ্রম আছে। এ স্থানের নৈসর্গিক শোভা ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে। আমার মত অনেকেই বার্ধক্যের কারণে অতদূর ওঠে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারেনি। ৩০০ ফুট উপরে একটি চত্বরে কয়েকটি মন্দির রয়েছে — দুর্গা, শিব — পাশে রয়েছে জলের ধারা — ভক্তরা জল সংগ্রহ করছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা নীচে নেমে আসি। উপরে একটি গুহায় সিদ্ধ পুরুষ ভবানন্দ সমাধিস্থ হতেন। এ পাহাড়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল — প্রচুর বেল গাছ পাহাড়ের আনাচে কানাচে রয়েছে। তাই এর অপর নাম বাবার বাগান। তারপর আমরা তপোবন যাই — বৈদ্যনাথ স্টেশন থেকে ১০ কিমি.। এটা মুনি ঋষিদের তপোভূমি। প্রাচীনকাল থেকে অনেক মুনি ঋষি এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই স্থানে মহাপন্ডিত রাবণ অনেকদিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পাহাড়ে ওঠতে প্রথমে ডানদিকে একটি পাহাড়ের গুহায় রয়েছে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মূর্তি। তিনি এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানেও সিঁড়ি

ও পাথরের চাঁই — এর উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে উপরে যেতে হবে। আমরা কিছুদূর ওঠে বসে পড়ি। এই তপোবনে একটি শিবলিঙ্গ প্রাতিষ্ঠিত আছে। আর রয়েছে ফুলকুন্ড নামে একটি পবিত্র কুন্ড। শিবলিঙ্গ দর্শন করে, কুন্ডে স্নান করলে মহাপুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। প্রবাদে আছে মহর্ষি বাল্মিকী এখানে তপস্যা করতেন। আদ্যাশক্তি জনক নন্দিনী সীতা এখানে স্নান করতেন। এক সময় এই তপোবন ছিল নাগাদের সাধনা ও সিদ্ধি প্রাপ্তির তপোস্থলী। পাহাড়ে পাহাড়ে পাথরের চাঁই ও সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই ভ্রমণসূচির বাকী অংশ বাদ পড়ে। চন্ডী পাহাড়ের ছোট শিব মন্দির এখন অযত্নে শোচনীয় অবস্থা। বর্তমানে এখানে জয় জগৎবন্ধু আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। কুন্ডেশ্বরী মন্দিরে জাগ্রত কালীর মূর্তি রয়েছে হরিলাজোড়ির একটি ঐতিহাসিক ইতিহাস রয়েছে। পূর্বে এখানে প্রচুর হরিতকী গাছ ছিল। বর্তমানেও দুটি গাছ প্রতীক হিসেবে বিরাজমান। তাই এর নাম হরিলাজোড়ি। এই স্থানেই রাক্ষসরাজ রাবণ বাবা বৈদ্যনাথকে নিয়ে লঙ্কায় যাওয়ার পথে, মূত্রবেগে প্রপীড়িত হয়ে পড়েছিল। তখন বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত। বিষ্ণুকে শিবলিঙ্গ দিয়ে রাবণ প্রস্রাব করতে বসে। এদিকে সেই শিবলিঙ্গ সেখানে রেখে প্রস্থান করে বিষ্ণু। তাই রাবণ সেই লিঙ্গ লঙ্কায় নিতে পারেনি। বাবা শিব সেখানে অচল অবস্থায় থেকে গেলেন। সেদিনের মত সফর শেষ করে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে আসি। ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার। আমাদের ভ্রমণসূচিতে আজ গিরিধি। দ্রষ্টব্য স্থান— (১) উসরি ফলস শহর থেকে ১০ কিমি. (২) খান্ডলী পার্ক, ৪ কিমি.। সকাল ৭টায় যথারীতি বেরিয়ে পড়ি—দরজায় অ্যাম্বেসেডর অপেক্ষায়। আমরা সবাই গাড়িতে উঠে পড়লাম—৬৫ কিমি. দূরে অবস্থিত গিরিধির উদ্দেশ্যে। ১১টা নাগাদ গিরিধি পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে ১০ কিমি. দূরে উসরী ফল্‌স। এই জলের ঝর্ণার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিবেশ এক কথায় বলা যায় অনিন্দ্য সুন্দর। প্রায় এক কিমি. অঞ্চল নিয়ে ছোট বড় পাথরের চাঁই এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝখানে বিরাট এক পাথরের চাঁই তিন-চার শত স্কোয়ার ফুট প্রায় সমতল কিছুটা ঢালু। এর উপর দিয়ে তিনটি জলের ধারা একে একে বয়ে চলেছে তারপর সশব্দে নীচে পড়ছে — আনুমানিক চার-পাঁচ ফুট নীচে। পিকনিক করতে এখানে এসেছে অনেকে।

ছেলেমেয়েরা কোথাও গল্প করছে কেউ কেউ পাথরের চাঁইয়ের উপর লাফিয়ে বিচরণ করছে। আবার কেউ কেউ পাথরের আড়ালে ঝর্ণায় স্নান করছে। আসবার পথে প্রবেশ দ্বারের আশে পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ রয়েছে। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা করছে কিছু যুবক-যুবতি। রাস্তার পাশে কয়েকটি তেলে ভাজার দোকান রয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার এক পাশে চট বিছিয়ে একটি লোক বিলেতি মদ বিক্রি করছে— রয়েল স্ট্যাগ, অফিসার্স চয়েস, ম্যাগডুয়েল। এই রকম দৃশ্য আমি পূর্বে কোথাও দেখিনি।

উসরী ফল্‌স থেকে শহরে ফিরে আমরা হোটেল ডেলি ইন্টারন্যাশনেলে দুপুরের খাওয়ার সেরে বেড়িয়ে পড়লাম — আমাদের ভ্রমণসূচির শেষ গন্তব্যস্থান খান্ডলী পার্ক — গিরিধি শহর থেকে তিন-চার কিমি. দূরে। একদিকে পাহাড়ে ঘেরা বিশাল সরোবর অপর পাড়ে এই খান্ডলী পার্ক। সেখানে রয়েছে ছোট শিশুদের জন্য রকমারী মনোরঞ্জনের সামগ্রী — টয় ট্রেন, নৌকা, দোলনা আরো অনেক। তাছাড়া ভ্রমণকারীরা টিকিট কেটে সরোবরে নৌকাবিহার করছে। পার্কের মাঝে রয়েছে একটা ছোট ক্যান্টিন — টিকিট কিনে নিজেদেরই খাবার সংগ্রহ করতে হয়। আমরা চারজন একটি নৌকা নিয়ে ২০ মিনিট সরোবরের জলে ইতস্তত ঘুরে আসলাম। একটা বাড়তি আনন্দ উপভোগ করলাম— নৌকা নিজেদের চালাতে হয়েছে। তারপর ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে আমরা বাহিরে এসে ড্রাইভারের খোঁজ করি। ফেরার পথে ফুলেশ্বরী একটি দর্শনীয় স্থান দেখা হল না সময়াভাবে। রাত্রি ৭টা নাগাদ দেওঘর হোটেল বৈদ্যনাথ বিহারে ফিরে আসি। পরদিন জনশতাব্দি এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরে আসি পাঁচদিনের সফর শেষে।

ঘুরে এলাম সুন্দরবন

ত্রিপুরা লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এর নাম এম.বি.বি. কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে পরিচিত ছিল। আগরতলা এম.বি.বি. কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন শাখা হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ২০০১ সালে - যতটুকু মনে পড়ে প্রথম অনুষ্ঠান হয় দমদম জেলের তখনকার ইনচার্জ দীপক চৌধুরীর বাড়িতে। বিশাল সরকারি আবাস—অনুষ্ঠানের পক্ষে খুবই প্রশস্ত। দীপক বাবু - আগরতলার নিজ বাড়ির কাছে কিছু দিন রামঠাকুর স্কুলেও শিক্ষকতা করেছেন। তিনি কলকাতায় এম.বি.বি. কলেজ এলামনি অ্যাসোসিয়েশন শাখা স্থাপনে প্রফেসর শ্যামা প্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর একজন উৎসাহী সহযোগী ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় শক্তি হালদার শিল্পী বিমল কর, আগরতলার আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সেই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবাই মুগ্ধ। সেখান থেকেই এম.বি.বি. কলেজ এলামনি অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা শাখা জন্ম লাভ করে।

তারপর অনুষ্ঠানিকভাবে এম.বি.বি. এলামনি অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা শাখা) এর কর্ম কর্তাদের নির্বাচন হয়। প্রতি বছরই চার পাঁচটি অনুষ্ঠান হয় - কলকাতার বিভিন্ন স্থানে যেখানে আমাদের আগরতলাবাসীদের একটা মিলন হয় পরস্পরের সঙ্গে, আদান প্রদান হয়। ভাবের, ভালবাসার প্রীতি ও শুভেচ্ছা এগুলি ছিল এসব অনুষ্ঠানের উপরি পাওনা।

এই সব অনুষ্ঠানে আগরতলায় বসবাসকারী অনেকেই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে যোগদান করত। কিন্তু যারা এম.বি.বি.কলেজের ছাত্র নয়। কার্যোপলক্ষে চাকুরি নিয়ে অনেক দিন ত্রিপুরায় বসবাস করে গেছেন, তারা আমাদের এসব অনুষ্ঠানে যোগদানে মাঝে মাঝে ইতস্তত করতেন। যদিও আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না।

এ নিয়ে আমাদের executive committee র মিটিং দীর্ঘ আলোচনার

পর স্থির হয় "এম.বি.বি. কলেজ এলামনি অ্যাসোসিয়েশন" পরে ত্রিপুরা লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে অভিহিত হয়।

এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছরে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করেন।

(১) বাৎসরিক মিলনোৎসব। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে কারো বাগান বাড়িতে হয়ে থাকে। সেখানে সকাল ৯টা থেকে সারাদিন গান বাজনা নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মিলনোৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কলকাতার রঙিন পরিবেশে অনেকদিন পর পরস্পরের সাক্ষাৎ এখানেই এই মিলনোৎসবের সার্থকতা। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে—কলেজ জীবনের পর চাকুরি জীবনে অবসরের পর এই সাক্ষাৎকার।

২) সারস্বত সম্মেলন — সাধারণত কলকাতা শহরের মাঝখানে ত্রিপুরা হিত সাধনী হলে (৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট) অনুষ্ঠিত হয়। এক বসন্ত সন্ধ্যায়—আমাদের ছেলে মেয়েদের নাচ গানে মুখর হয়ে ওঠে এই সারস্বত সম্মেলন। তাছাড়া ত্রিপুরার বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা করা হয়। জলদবরণ গাঙ্গুলী, অচিন্ত্য রায়, ডাঃ বসা'ক, ডাঃ রথিন দত্ত অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত, মন্টু দেবনাথ, শক্তি গণচৌধুরী ও আরো অনেকে।

একবার গঙ্গাবক্ষে জাহাজে সারাদিন ব্যাপী — অনুষ্ঠান চলে। প্রায় ৭০ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নাচ গান আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে — সেই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সব মিলে গঙ্গা বক্ষে চলমান জাহাজে এক আনন্দের হৈ হুল্লোর চলে ৭/৮ ঘণ্টা ব্যাপী। এই রকম একটি অনুষ্ঠান ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুন্দরবন অঞ্চলে হয়েছিল। তিন দিন দুই রাত্রি আমরা ৫৭ জন সদস্য লঞ্চে সাগরদ্বীপ পাড়ি দিয়েছি। ডাঃ বসাক, ডাঃ রথিন দত্ত, লেখক মৃণাল কর ও গোপেন্দু চৌধুরী সেবারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ক্যানিং থেকে আমাদের তিনদিনের যাত্রা শুরু হয় "সাগর সম্রাটে"। আমরা

নির্দিষ্ট সময়ে ক্যানিং এর জেটিতে গিয়ে হাজির হই — কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেনে এবং রিক্সায়। ১১টা নাগাদ পৌঁছে দেখি আমাদের লঞ্চ "সাগর সম্রাট" প্রস্তুত, আমরা সবাই একে একে লঞ্চে উঠি। জেটি না থাকায় সাবধানে ওঠা নামা করতে হয়। লঞ্চের লোকজন আমাদের প্রাতঃরাশ দিলেন। লঞ্চের মধ্যে শক্তি বিকাশ রায় আমাদের একজন সক্রিয় সদস্য এই সব ব্যবস্থা করেছেন, তাতে স্বাভাবিক ভাবে খরচ কম হয়েছে—আমাদের প্রত্যেককে ১০৫০ টাকা করে দিতে হয়েছে। তিন দিনের যাতায়াত খাওয়া, লঞ্চে থাকার সমস্ত খরচ বাবদ। যাত্রা শুরু করার পর প্রথমে আমরা পৌঁছলাম— সজনেখালি হয়ে সজনে খালি রামকৃষ্ণ মন্দির ও আশ্রম—মাতলা নদীর পাড়ে। চারিদিকে রয়েছে ঝোপ জঙ্গল আর মাঝে আশ্রমের এক পাশে মন্দির—সামনে মাতলা নদী। বিদ্যাধরী নদী। জল জঙ্গলের অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মধ্যে এই মন্দির প্রাঙ্গণ এক অপূর্ব ঐশ্বরিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মন্দির দর্শন শেষে আমরা সবাই গিয়ে লঞ্চে উঠি। তারপর একটানা লঞ্চে সন্ধ্যা পর্যন্ত। লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে যেদিকে দেখা যায় শুধু জল আর জল। এখানে সপ্তনদীর মিলন হয়েছে — নেতী খোপানী - বিদ্যাধরী, মাতলা, পীরখলি, গাজী, খালি, নাবাশ্চি হেরোডাঙ্গা সপ্তনদীর মিলনে অন্তহীন জলরাশির এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আমাদের লঞ্চ সোনা খালি সজনেখালী গোসাবা সুধন্য খালি হয়ে দয়াপুর টাইগার প্রকল্প বামদিকে রেখে নামখানার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা নিয়ে রয়েছে। ভাসতে ভাসতে ভাগ্য ভাল হলে ব্যাঘ্র দেখা পেয়ে যেতে পারেন। আমাদের অবশ্য সেই সৌভাগ্য হয়নি। অবশ্য আমরা কুমীর দেখেছি—বালুচরে নিদ্রায়। নদীর পাড়ে গর্জন ও সুন্দরী গাছের ফাঁকে দেখতে পারেন হরিণ বাঁদরদের ছোটাছুটি। মাঝে মাঝে বন্য শূকরের আবির্ভাব হয়। দুপুরে আকাশে রয়েছে ঈগল, চিল ও মরাল দম্পতির আনাগোনা।

সন্ধ্যায় আমাদের লঞ্চ নামখানায় পৌঁছে। শক্তি বিকাশ রায়, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী বেরিয়ে পড়লেন বিভিন্ন লজে ও হোটেলে— আমাদের ৫৭ জনের থাকবার ব্যবস্থা করার জন্য। লঞ্চে রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা যার যার হোটেলে ও লজে চলে যাই।

পরেরদিনের সকাল ৭টায় আমরা প্রাতঃরাশ সেরে সাগরদ্বীপ যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। নদীর অপর পাড়ে কচুবেরিয়া— সেখানে বাস গাড়ি রয়েছে—সাগরদ্বীপ যাওয়ার। আমরা লঞ্চে নদী পার হয়ে কচুবেরিয়া বাস স্ট্যান্ড আসি। সেখান থেকে ৩০ কিলোমিটার সেই পবিত্র সঙ্গম স্থল—সাগরদ্বীপ ও কপিল মুনির আশ্রম। আমরা প্রথমে যাই সাগরের চরে — কপিল মুনির মন্দির থেকে সামনে কিছুদূরে। সেখানে পৌষ মাসে সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে— ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। কথায় বলে" সব তীর্থ বার বার গঙ্গা সাগর এক বার" এখানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। সঙ্গম স্থলে বিরাট চরে প্রচুর লোকের সমাগম। অনেক সাধু সন্ন্যাসীও রয়েছে। এখানে সেখানে কিছু শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ হচ্ছে। আমার বন্ধু শ্যামা বাবু ইতিমধ্যে জলে নেমে পড়েছেন, সঙ্গে ডাক্তার ভদ্র ও ছিলেন। পবিত্র গঙ্গা স্নান সেরে নিলেন।

তারপর কপিল মুনি মন্দির। সেখানে আমরা মন্দির দর্শন করি ও ভোগ দেই। সেখান থেকে আমরা ভারত সেবাশ্রমে যাই। সামনে খোলামাঠ, ফুলের বাগান। এর পর মন্দির ও অতিথিশালা। শুনেছি যাত্রীদের থাকবার সুব্যবস্থা রয়েছে। তারপর ফিরে আসি এবং রাত্রে নামখানায় যার যার হোটেলে আশ্রয় নেই।

পরদিন ভোরে আমরা সবাই লঞ্চে ফিরে আসি ও প্রাতঃরাশ নেই। উপরের ডেকে গিয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়ি—নদী ও জঙ্গলের শোভা দেখবার জন্য। নদীর পাড়ে সুন্দরী ও ম্যানগ্রোভ গাছের অরণ্য রয়েছে। এরপর আমরা সুন্দর বনের কুমীর প্রকল্প দেখার জন্য লঞ্চ থেকে নেমে পড়ি। এটা ভগবতীপুর কুমীর প্রকল্প নামে পরিচিত। এটা সংরক্ষিত এরিয়া। আমরা অনুমতি নিয়ে টিকিট কেটে ভিতরে যাই। বিভিন্ন বয়সের কুমীরদের সেখানে শ্রেণিবদ্ধভাবে বিভিন্ন জায়গায় রাখা আছে। কয়েকটি বিশাল আকারের কুমীর ও রয়েছে। চিংড়ি মাছের প্রকল্প রয়েছে রায়চকের কাছে। তারপর আমরা সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাই পখিরালয় লজে। সেখানে আমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। পর দিন আমরা যথারীতি সকাল ৯টা নাগাদ লঞ্চে চলে যাই। আমাদের তিন দিনের সফর, শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে ক্যানিং বন্দরে পৌঁছে যাব। চায়ের আসরে আমরা

পরস্পর কথাবার্তা সেরে নিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে নেই। তারপর ১২টা নাগাদ দুপুরের খাবার সেরে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হই লঞ্চ থেকে নামবার জন্য। ২টা নাগাদ লঞ্চ ক্যানিং বন্দরে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে রিক্সা করে ক্যানিং স্টেশনে যাই। তারপর শিয়ালদহ্ স্টেশনে পৌঁছে আমরা একে একে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরি।

সুন্দরবন কি ভাবে যাবেন? দুই ভাবে যাওয়া যায় । তবে সব থেকে সহজ যাওয়ার উপায় ক্যানিং থেকে। শিয়ালদহ্ (সাউথ) থেকে ক্যানিং যাওয়ার প্রচুর ট্রেন ছাড়ে। ক্যানিং পৌঁছে সেখান থেকে গোসাবা গেলেই শুরু হয়ে গেল সুন্দরবন। গোসাবা হল সুন্দরবনের গেটওয়ে। সেখান থেকে প্রবেশ করতে হয় গহণ অরণ্যে।

অন্যদিকে নামখানা দিয়ে সুন্দর বন যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা ২ ঘণ্টার পথ এবার লঞ্চ বা অন্য কোন যানে সুন্দর বনের ভিতরে। সরকারি পর্যটন দপ্তর পর্যটকদের সুন্দরবনে নিয়ে যায় সোনাখালি হয়ে— সজনেখালি। এর পর জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় সুধন্য খালি নেতি খোপানি, কুড়ি ধাবড়ি এবং বিছাখলি। আবার কোন কোন লঞ্চ মোহনার দিকে যায় গঙ্গা সাগর।

সরকারি বন্দোবস্তে সুন্দরবন যেতে হলে সব থেকে ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক উপায়ে তৈরি দুটি লঞ্চ এম ডি সর্ব জয়া এবং এম ডি চিত্র লেখায়। শীতের সময়ে এক রাত ২ দিন কিংবা ২ রাত ৩ দিনের সফরে সুন্দর বন ঘুরে আসা যায়। খাওয়া দাওয়া এবং থাকা সব লঞ্চের ভিতরেই। বিভিন্ন স্পটে নিয়ে যাওয়া কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আলাদা কোন খরচ নেই। সব খরচ ধরা থাকছে একসঙ্গেই।

এম ডি সর্বজয়ায় কিউ বিকেল ক্লাসে বার্থ রয়েছে ৩২টা। এক রাত ২ দিনের সফরে গেলে লাগবে ১৫৫০ টাকা, দুই রাত ৩ দিনের সফরে লাগবে ২৬০০। লোয়ার ডেকে বার্থ রয়েছে ১০টি। ২ দিনের সফরে লাগবে ১৩৫০ টাকা, এবং ৩

দিনের সফরে লাগছে ২০৫০ টাকা, বেউরোলে পাওয়া যেতে পারে— ১৬ জন— দুই দিনের সফরে লাগবে ১২০০ টাকা, ৩ দিনের সফরে ১৭৫০ টাকা।

এম.ডি.চিত্র লেখায়—উবল বেউ ক্যাপ আছে— ১টি, ২দিনের সফরে খরচ পড়ে ২৪০০ টাকা। তিন দিনের সফরে খরচ পড়ছে ৩৩৫০ টাকা, কেবিন ক্লাসে অর্থ ১০টা। ২ দিনের সফরে ২১০০ টাকা, ৩ দিনের সফরে ২৮৫০ টাকা। কেউ বিকেল ক্লাসে বার্থ রয়েছে ১২টা। ২ দিনের সফরে মাথাপিছু খরচ ১৮৫০ টাকা, তিন দিনের সফরে ২৬০০ টাকা। লোয়ার ডেকে বার্থ আছে ১০টা। ২টা দিনের খরচ ১৩৫০ টাকা, ৩ দিনের খরচ ২০৫০ টাকা। বেড রোলে থাকতে পারেন। (২৬ জন) এতে ২ দিনের মাথা পিছু লাগছে ১২০০ টাকা, আর ৩ দিনের সফরে ১৭৫০ টাকা।

বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। ট্যুরিজম সেন্টার— ৩/২, বিবাদী বাগ, কলি-ফোন ২২৪৮-৫৯১৭/৮২৭২/৫১৬৮

ঘুরে এলাম ওঙ্কারনাথ আশ্রম (যোগেন্দ্র মঠ) সঙ্গে কাশীপুর উদ্যান বাটী

মেযে সুস্মিতা ফোন করে জানাল আমরা সপরিবার ৯ মার্চ ব্যারাকপুর যাব যোগেন্দ্র মঠে, প্রসাদ নিব। বাবা সীতানাথ ওঙ্কার নাথের ১০৬তম জন্মদিন। সারাদিন নগর সংকীর্তন কীর্তন, ভগবৎ আলোচনা চলবে। চল ভাল লাগবে। আমরা রবিবার দিন ১০টা নাগাদ প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি — জামাতা, মেয়ে ও নাতি গাড়ি নিয়ে হাজিব ১০.২০ মিঃ

আমবা বওনা হই ব্যারাকপুরের উদ্দেশ্যে ১১-৪৫ মি. নাগাদ মঠে পৌঁছে যাই — যোগেন্দ্রমঠ, তালপুকুর বাচস্পতি পাড়া।

মঠেব সেক্রেটারী গোবিন্দ চক্রবর্তী আমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন। প্রবেশ পথেই আমাদের দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরেন। আমাদের কোষাধ্যক্ষের ঘবে নিয়ে বসবার ব্যবস্থা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারি - এ আশ্রমে মন্দির নির্মাণ (সংস্কার) নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আদালতে নালিশ করে ইঞ্জাংশন দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। তাবপব আমার জামাতা এডভোকেট, হাইকোর্টের সহায়তায়, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে বিপদ মুক্ত হয়। তাই আমাদের খাতির। মন্দিরের আঙ্গিনায় লোকে লোকারণ্য। কীর্তন হচ্ছে ভাগবৎ পাঠ চলছে। পাশে — রান্না হচ্ছে ভক্তদের জন্য। কিছুক্ষণ বিশ্রামেব পর পাশের ঘরে আমাদের প্রসাদ নেওয়ার ব্যবস্থা। প্রসাদ নেওয়ার পর পাশে এক বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করি। ঘণ্টা দুয়েক পরে মন্দিরে আসি।

শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারাম দাশ ওঙ্কারনাথদেবের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসেছেন। এসেছেন কলকাতা ও কলকাতার বাইরে থেকেও। গোপাল মিত্র সীতারাম ওঙ্কার নাথের শিষ্য। তিনিও এসে গুরুদেবের বিভিন্ন কর্ম কান্ডের উপর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি একজন স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার। লাদেন বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত ইউ.ইন.ও.বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনার সঙ্গে এক সময় তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা কিছুক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণে বসে শ্রী গোপাল মিত্রের বক্তৃতা শুনলাম। তারপর ফেরার পথে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে যাই। গঙ্গাতীরে সুন্দর পরিবেশে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে আমরা রওনা দেই। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কাশীপুর উদ্যান বাটীতে পৌঁছি। দোতালায় রামকৃষ্ণের ফটো রয়েছে — যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নীচে নামতে ডান দিকে রয়েছে শ্রীমার ঘর। নীচের ঘরেও রামকৃষ্ণের ছবি সাজানো। চারিদিকে ফুলের বাগান। পিছনে অফিস ঘর। সেখানে রয়েছে একটি "খেঁজুর গাছ"। সুন্দর করে সাজিয়ে সংরক্ষিত। কাশীপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুর যখন অসুস্থ। তখন একদিন ভক্ত নরেন্দ্রাদি খেঁজুরের রস খাবার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু সেখানে একটি কাল সাপ থাকত। হঠাৎ ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য—তিনি খেঁজুর গাছের নীচে কাল সাপ থেকে ভক্তদের রক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত। এসব কাহিনী এখন বহুল প্রচারিত। এখানে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমার মানসপটে ভেসে উঠল।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হলেন সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক।

গীতায় ভগবান অর্জুন কে বললেন "যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সে ভাবে তাহাদিগকে দয়া করে থাকি। লোকে সকল প্রকারে আমারই পথে চলিয়া যাবে অর্থাৎ সে যে পথই অনুসরণ করুক না কেন সকল পথেই আমাতেই পৌঁছিতে পারে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন 'যতমত তত পথ'। ঠাকুর নিজ জীবনেই বিভিন্ন ধর্ম মত ও পথ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন সর্ব ধর্ম মত

ও পথ সত্য। সব পথ দিয়াই তাঁহার কাছে পৌঁছান যায়। চাই বিশ্বাস ও ভক্তি।

'যেমন কালীঘাটে তুমি হেঁটেও যেতে পার। নৌকা করে যেতে পার, বাসে করেও যেতে পার আর ট্রেনে করেও যেতে পারে, যেতে পারলেই হল।

আন্তরিক হলে সব ধর্মের মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরা, শাক্তরা বেদান্তবাদীরা, মুসলমান খ্রীষ্টানরা সকলেই তাকে পাবে। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়।

ধর্মের গোঁড়ামি খুবই নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীষ্টান, এই নিয়ে বিবাদ করা অসঙ্গত। সব ধর্মই সমান। যেমন গাছের গুঁড়ি এক, কিন্তু কান্ড, শাখা, প্রশাখা পাতা পল্লব ইত্যাদি নিয়েই পূর্ণাঙ্গ গাছ।

যে কোন একটা ভাবকে আশ্রয় কবলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কলিযুগে ভক্তি। সনাতন ঋষিরা শান্তভাব নিয়েছিলেন, হনুমান দাস্য ভাব, বৃন্দাবনের শ্রীদাম সুদাম সখ্য ভাব নিয়েছিলেন। যশোদার বাৎসল্য ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরেতে সন্তান ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "ব্যাকুলতা থাকলেই হল"। তিনি অন্তর্যামী ব্যাকুলতা ও টান বুঝতে পারেন। তাই ঠাকুর তত্ত্ব সাধনায় ইসলাম ধর্ম সাধনায়, বেদান্ত সাধনায়, খৃষ্ট ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে সবাই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছতে পারে।

কাশীপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুর যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, একদিন নরেন মনে মনে চিন্তা করিলেন "এই ভীষণ দুরারোগ্য ব্যাধির মধ্যে যদি ঠাকুর মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারেন তিনি ভগবানের অবতার তাহা হইলেই আমি তাঁকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিব নতুবা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই চিন্তা নরেন্দ্র নাথের মনে উদয় হওয়া মাত্র ঠাকুর দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন। "এখনও অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের উক্তি শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি কাশীপুর

উদ্যানবাটীতে ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে বলছেন, "তুমি যে সকলকে আমার সম্বন্ধে অত কথা বলিয়া বেড়াও তুমি কি দেখিয়াছ ও কি বুঝিয়াছ? গিরিশ নতজানু হইয়া নত জোড় করিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন "ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করিতে পারে নাই আমি আর তার সম্বন্ধে কি বলতে পারি?" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন "তোমাদের আর কি বলব? তোমাদের চৈতন্য হউক। এই কথা বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তগণ সেদিনকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়া ছিলেন। সেই হইতে এখনও প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমারোহের সহিত ঠাকুরের কল্পতরু উৎসব পালিত হইয়া থাকে।

তারপর ভাড়াক্রান্ত মন নিয়ে গাড়িতে উঠি— ৭টায় ফিরে আসি আবাসনে।

দার্জিলিং সফর (জলপাইগুড়ি হয়ে)

কলকাতা থেকে ১.৩৫ মিনিটে তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে রওয়ানা হই। জামাতা অনিত টেক্সি নিয়ে আসে ১২.৪০ মিনিটে। আমরা রওয়ানা হই সঙ্গে ভাস্করও ছিল এবং কেস্টপুর নেমে যায়। সল্টলেকে তার অফিসে যাওয়ার জন্য। স্টেশনে পৌঁছে আমরা ৯বি প্ল্যাটফর্মের কাছে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় একজন বলছে আপনার টাকা পড়েছে — আমি বুক পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখছিলাম। ১০/১২ টাকার নোট কুড়িয়ে আমার হাতে গুঁজে দিচ্ছে — আমি আশ্চর্য হলাম — একটু পরে এক ভদ্রলোক এসে আমার সংশয় দূর করলেন। আমি টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হলাম।

এরপর আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল আমি ও আমার স্ত্রী আরতী আমাদের লাগেজ থেকে সরে গিয়ে পাখার নীচে দাঁড়িয়েছিলাম, জামাতা অনিত লাগেজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ৯বি লাইনে গাড়ি আসছে কিনা দেখছে। এমন সময় একটা ছেলে (২০-২২ বছর) গলায় কুলির লাল কাপড়, হঠাৎ হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিল—আমি ডাকদিতেই সে ব্যাগ ফেলে ছুটতে চাইলে আমি পেছন থেকে তার জামার কলার ধরে ফেলি। তারপর জামাতা অনিত এসে তাকে চড় থাপ্পর দিল — অনেক দর্শক এসে তাকে মারতে লাগল। অনিত রেলওয়ে কর্মকর্তাদের জানাল। তারা কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিল না। যথা সময়ে ট্রেন এসে গেল। আমরা আমাদের সংরক্ষিত আসন খোঁজ করে বসলাম—আমার জামাতা অনিত এ সব বিষয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

১.৪০ নাগাদ ট্রেন ছাড়ল শিয়ালদহ থেকে। ব্যারাকপুর হয়ে নৈহাটী দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে ৩টা নাগাদ বেন্ডেল পৌঁছে। তারপর নবদ্বীপ কালনা হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফারাক্কা পৌঁছে। ট্রেনে গরম, যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেটেছে, রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় আরামদায়ক হয় যাত্রার শেষ অংশটুকু। ভোর ৬টায় জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নামি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে শ্যামল (গিরিজা দিদির ছেলে) স্কুটার নিয়ে উপস্থিত। আমরা রিক্সায় আই ফাউন্ডেশনের কাছে শ্যামলের বাড়িতে পৌঁছই। দোতালা সুন্দর বাড়ী মার্বেল ফ্লোর, ঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত আধুনিক রুচির সাক্ষ্য বহন করছে।

যথেষ্ট ক্লান্ত থাকায় চা, টিফিন করে বিশ্রাম নিলাম। গিরিজা দিদিকে প্রণাম দিতে গিয়ে অনেক স্মৃতি ভেসে উঠল। তারা ছয় ভাই বোনের মধ্যে দুইজন বেঁচে আছে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা গিরিজা দিদি ৯১ বছর ও সর্ব কনিষ্ঠ ৭৮ বছর বয়স্কা সুশীলা দিদি।

বিকালে সান্ধ্য ভ্রমণে বেড়িয়ে ব্রীজের কাছে বাজার থেকে পান সুপারী সংগ্রহ করলাম। ফেরার সময় কিছু মিষ্টি নিয়ে এলাম। পরদিন ১২ই জুন ভোরে চা বিস্কিট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আই ফাউন্ডেশন থেকে এগিয়ে গিয়ে একটি বিশাল দিঘির পাড়ে উঠে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর পাড়ে বাঁধানো ঘাটলায় এসে পড়ি — সামনে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি - ময়নাগুড়ি - ধূপগুড়ি ও আসাম যাওয়ার ন্যাশনাল হাইওয়ে পূর্বদিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার উত্তর পাশে রাজবাড়ির সিংহ দরজা তারপর রয়েছে ব্লক অফিস হাউজিং কমপ্লেক্স, তিস্তা পর্যটক ভবন। অবশ্য রাজবাড়ির আগে অর্থাৎ পশ্চিমে রয়েছে স্পোর্ট কমপ্লেক্স। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির একটু পরিচয় নেওয়া যাক। উত্তরবঙ্গে তিনটি জিলার মাঝে রয়েছে জলপাইগুড়ি — ৩টি মহকুমা নিয়ে, পূর্বে দার্জিলিং, পশ্চিমে কোচবিহার। জলপাইগুড়ি জেলার নামকরণ হয়েছে জলপাইয়ের অরণ্য থেকে। গুড়ি মানে স্থান। পুরাকালে এর বেশির ভাগ জায়গাই কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬৫ সালে ইংরেজরা ডুয়ার্স দখল করে — নাম দেয় জলপাইগুড়ি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় কিছু অংশ পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যায়। জলপাইগুড়ির মোট আয়তন ৬২৭৭ বঃ কিমি.।

এই জেলায় প্রধানত আদিবাসীদের বসতি— ওঁরাও, সাঁওতাল, মাহলী, মুন্ডা, মালি, পাহাড়িয়া সেচ, লেপচা, ভুটিয়া, রাগ, গারো প্রভৃতি। আর রয়েছে বিচিত্র
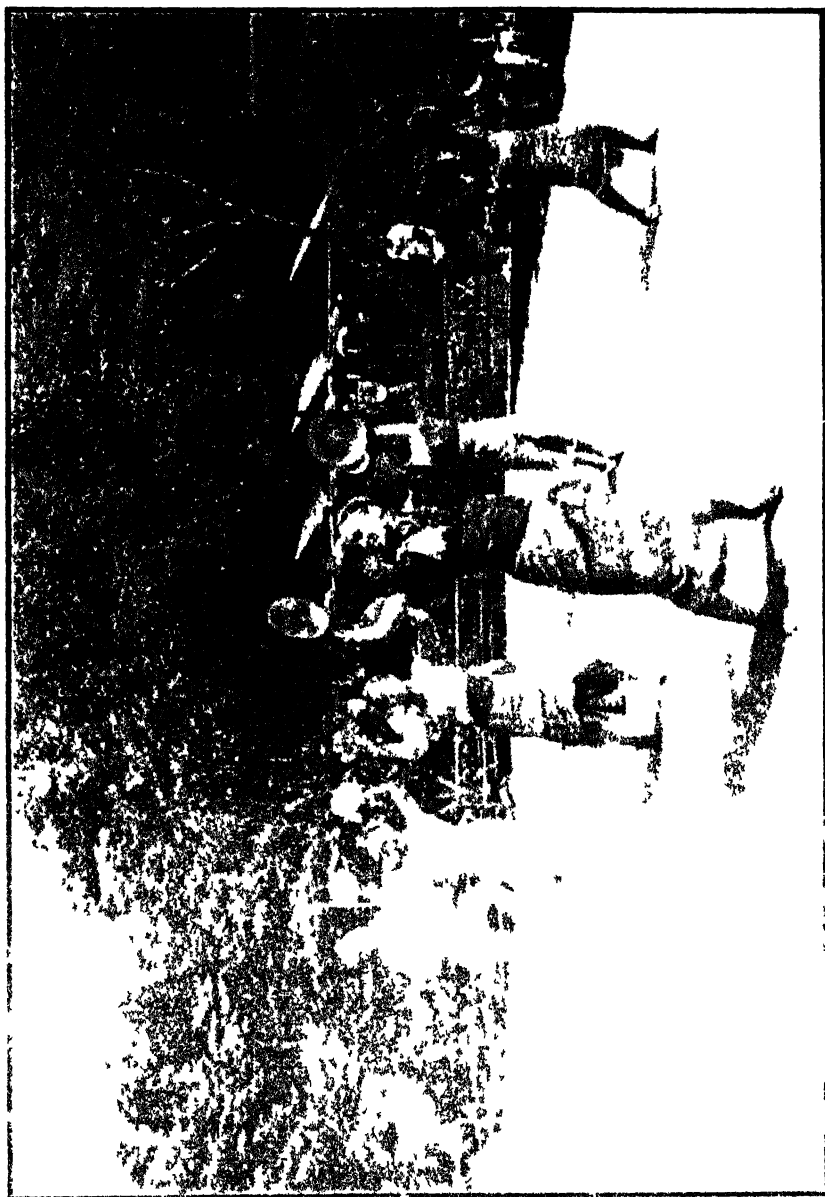
Cultural Show at Gangamaya Park - Darjeeling
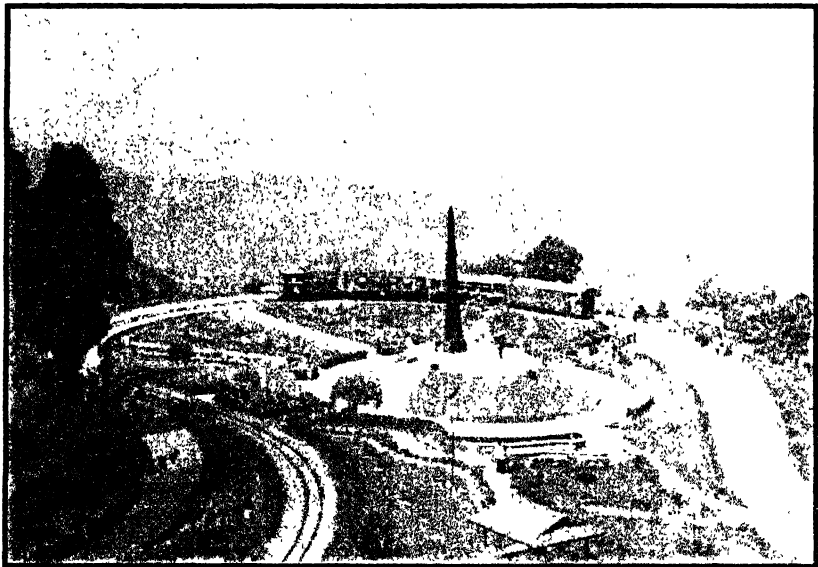
Balasia Loop War Memorial - Darjeeling

Shrubbery Nightingale Park - Darjeeling

আদিবাসী টোটো। এরা গভীর অরণ্যে বাঁশের মাচার ঘর তৈরি করে থাকে।

জলপাইগুড়ি শহরে এই আদিবাসীদের তেমন কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীরাই শহরের প্রধান অধিবাসী। উত্তরে পাহাড় ও গভীর জঙ্গল। দক্ষিণে রয়েছে পলি মিশ্রিত উর্বর সমভূমি। নদী রয়েছে মহানন্দা, জলঢাকা, তিস্তা, ফরতোয়া, উর্বর ভূমি, ফসল উৎপাদনের সহায়ক। ডুয়ার্স অঞ্চলে চায়ের বাগান প্রসিদ্ধ। এছাড়া ধান, তামাক, কমলা, লেবু, সুপারী আর রয়েছে বিপুল বনজ সম্পদ।

তারপর রিক্সা করে ফিরে আসি — এখানে রিক্সা ভাড়া তুলনামূলক ভাবে কম। সন্ধ্যায় বিয়ে বাড়ি "তিস্তা পর্যটক ভবন।" ১৭,৫০০্ ভাড়ায় নিয়েছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে জন প্রতি ১৪৫্। ২ দিনের জন্য সব নিয়ে খরচ পড়েছে ৭০,০০০ টাকা, সুন্দর ভবনে বিয়ে সম্পন্ন হয়। আমরা ১২ টার পর ফিরে যাই। শ্যামলের মেয়ে অনুসূয়া (শিক্ষিকা) বিয়ে ধূপগুড়ির জয়ন্তর সঙ্গে। পরদিন ১৩ জুন ভোরে আমরা চা খেয়ে বিশ্রাম নিলাম। দুপুরে "তিস্তা পর্যটক ভবনে" প্রাতঃরাশ ও ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। খাওয়া সেরে ফিরে এসে বিশ্রাম করি। সন্ধ্যায় ৭টায় বৌ জামাই আসে ঠাকুর প্রণাম করতে। সবাইর সঙ্গে আমরা ২ জন ও আশির্বাদ করলাম বৌ জামাইকে ১০০ টাকা করে দিয়ে; তারপর আমরা গেট পর্যন্ত গেলাম বিদায় জানাতে। ফিরে এসে আরতী জানাল — টেবিলে মোবাইলটি নেই, নেই নেই নেই খোঁজা খুঁজি নিস্ফল রিং করে কোন রেসপন্স পাওয়া যায়নি। খুব অশান্তি নিয়ে রাত্রিটা কাটাল। পরদিন ১৪ই জুন ভোরে চা খেয়ে আমরা দুইজন বেরিয়ে গেলাম। তারপর জলপাইগুড়ি পুলিশ স্টেশন-এ যাই এবং এফ.আই.আর করি নং ৮৫২/০৬ সেখান থেকে গিয়ে এস.টি.ডি বুথ থেকে ফোন করি ছেলে ভাস্কর কে এবং মোবাইল লস্-এর খবর জানাই সেই সঙ্গে এফ আই আর এর কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

সেখান থেকে শান্তিপাড়া বাস স্ট্যান্ড-এ যাই অমলের (শ্যামলের ছোট ভাই) বাসায় কিছু মিষ্টি নিয়ে। ১২টা নাগাদ ফিরে আসি।

সন্ধ্যা ৮ টা নাগাদ আমরা ৪০/৪৫ জন বৌভাত নিমন্ত্রণে ধূপগুড়ি যাই ৫৫ কিলোমিটার। সেখানে দিলীপ বোসের সঙ্গে পরিচয় — তিনি জামাইর জেঠামশায় (সর্ব জ্যেষ্ঠ)। এক সময় ভাল খেলতেন। এখন ব্যাটমিন্টন কোচ। রায়গঞ্জে বাড়ি। রায়গঞ্জে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

আরেক জনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে সে হল গিরিজা দি'র বড় মেয়ের (আলিপুর দুয়ার) জামাই ইংলিশে এম-এ ধূপগুড়ি কাছে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়সও বেশি নয়। ৪০-৪৫ হবে। মিষ্টি স্বভাব কথা বার্তা মার্জিত ও নম্র। রাত্রি ২টায় খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা ফিরে আসি জলপাইগুড়ি।

পরদিন ১৫ই জুন আমাদের দার্জিলিং সফরের পরিকল্পনা রয়েছে। ভোর ৭টা নাগাদ চা বিস্কিট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম — আমরা দুইজন আই ফাউন্ডেশন এর সংলগ্ন একটি এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করি — এখান থেকে প্যাকেজ টুর-এর সুবিধা নেই। গাড়ি নিয়ে যেতে ১৬০০ টাকা। সেখান থেকে একটি রিক্সা নিয়ে তিস্তা পার্ক। বন্ধ থাকায় দেখা হল না। তারপর আমরা রিক্সা করে কিছুক্ষণ ঘুরে বাজার থেকে পান কিনে ১২টা নাগাদ ফিরে আসি।

সন্ধ্যায় বাপির (শ্যামলের ছেলে) সঙ্গে আলাপ করে ১৬ তারিখ ১০টায় দার্জিলিং কালিম্পং যাওয়ার প্রোগ্রাম করি। পরদিন ১৬ জুন যথাসময়ে ১০টায় টাটা ইন্ডিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি প্রসেনজিৎ ও রোনিকে সঙ্গে নিয়ে, শিলিগুড়ি হয়ে আমরা দার্জিলিং পৌঁছি ২টা নাগাদ। সেখানে নারায়ণ সাহা এস.আই.পুলিশের সঙ্গে থানায় দেখা করি। প্রসেনজিতের বন্ধুর সুবাদে সে আমাদের হোটেলের বুকিং করেছে — সোনালী হোটেল — চৌরাস্তার কাছে। আমরা সেখানে রুম নং-৩এ ছিলাম। ০৩৫৪-২২৫৬৬৬৪। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করে — নাইটেঙ্গেল পার্ক এ যাই। ২০ টাকা করে টিকিট নিয়ে পার্কএ প্রবেশ করি। আমাদের সঙ্গে ড্রাইভার নারায়ণও ছিল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা ওপেন স্টেজ-এর সামনে বসি। তারপর সেখানে একটার পর একটা আঞ্চলিক নৃত্য হচ্ছে— আমরা অনেকক্ষণ এই সুন্দর পরিবেশে এই সব আঞ্চলিক নৃত্য উপভোগ করলাম। বাপি ও রোনি ইতিমধ্যে পার্ক এ এসে গেছে। আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

চৌরাস্তা — দার্জিলিং

রেড্ পান্ডা — দার্জিলিং

রক গার্ডেন — দার্জিলিং
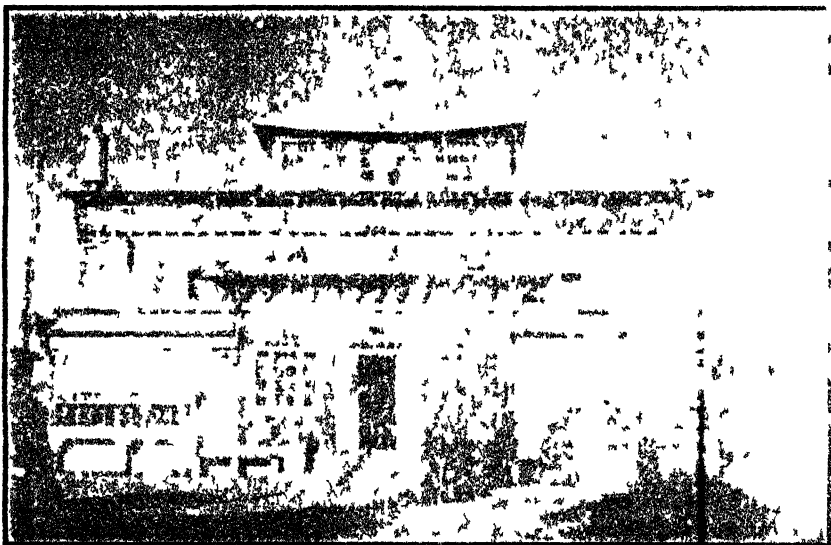
ঘুম মনাস্ট্রী — দার্জিলিং

পরদিন দার্জিলিং ভ্রমণে যাওয়ার আগে কিছু তথ্য ও দর্শনীয় স্থানের পবিচয় সংগ্রহ করলাম। পাহাড়ি শহর দার্জিলিং এর খ্যাতি আলাদা, দার্জিলিংকে শৈলবাসের রানী বলা হয়। দার্জিলিং-এর নিসর্গ চিত্র তুষার মন্ডিত হিমালয় শৈল শ্রেণী পাহাড়ি ঝর্ণা, উপত্যকার সবুজ বর্ণালী বৈচিত্র্য দেখতে দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকের ভীড় সারা বৎসরই লেগে আছে। এক সময় এই শহরটি ভারতের গভর্নর ও পরে বাংলার গভর্নরের গ্রীষ্মাবাস ছিল।

১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার এই শৈল শহরের পত্তন করে তাদের সরকারি কর্মচারীদেব স্বাস্থ্য নিবাস রূপে। সিকিমের মহারাজা বন্ধুত্বের নিদর্শন রূপে ইংরেজদের এই দার্জিলিং উপহার দেয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে শেষ ভূমি সীমায় হিমালয়ের পর্বত মালার গায়ে এই সুন্দর প্রহরী শহর — সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ২০৭৬ মিটার।

"দার্জিলিং" একটি তীব্বতীয় শব্দ — দারজী মানে বজ্র আর লিং মানে স্থান। Hence it is called a "Land of thunderbolt" ১৮৩৯ সালে ডাঃ ক্যাম্পবেল এখানে আসেন, পাহাড় বন ও কিছু পাহাড়ি লোক। ২১ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় এই শহর গড়ে উঠে শৈলবাসী ইংরেজ শাসক ও কর্মচারীদের।

দার্জিলিং জেলায় মহকুমা, দার্জিলিং সদর, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি আয়তন ৩১৪৯ বর্গকিলোমিটার—লোক সংখ্যা ১৮ লক্ষ। বর্তমান দার্জিলিং গোর্খারাই প্রধান অধিবাসী, আগে বেশির ভাগই ছিল ভুটিয়া, লেপচা, বাঙ্গালীর সংখ্যা কম। ধর্ম প্রধানত বৌদ্ধ। তাই দার্জিলিং পাহাড়ে এখানে সেখানে রয়েছে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার — সেখানে উচ্চারিত হচ্ছে 'বুদ্ধ' শরণং গচ্ছামি' বুদ্ধের বন্দনা ও আরাধনা। অধিবাসীদের সামাজিক ধর্মীয় জীবনে গান নৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৭ তারিখে ভোরে ওঠে প্রাতঃভ্রমণ সেরে নিলাম। স্নান করার প্রশ্ন নেই।

ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। ৪০০্ টাকা দিয়ে একটা মারুতি ভাড়া নিলাম প্রথমে রক গার্ডেন গেলাম ৪-৫ ধাপে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝর্ণার জল নেমে আসছে, ঝরনার উপর দিয়ে এপার ওপার যাওয়ার জন্য ব্রীজ রয়েছে — নীচে থেকে দেখতে খুব সুন্দর দেখায় ধাপে ধাপে সিলভার লাইনিং — দু'দিকে রয়েছে ফুলের বাগান — ওক ম্যাপেলের গাছ।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম গঙ্গা মায়া পার্ক, শহর থেকে ১০ কিমি. দূরে, রক গার্ডেন-এর কাছেই। এখানে ঝর্ণার পর ঝর্ণার এখানে একটা বাঁধানো জলাধারে — অনেক বড় বড় মাছ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শেষ প্রান্তে একটি বিরাট পাথর তিন তলার মত উঁচু লাল রঙ সবাই প্রণাম জানাচ্ছে। সেখানে নীচের দিকে আসতেই দেখলাম একটা ওপেন স্টেজ এ ট্রাইবেল কালচারেল শো—একটার পর একটা নৃত্য। এ শহরে ঢোকবার মুখে Balasia Loop war memorial দেখি শহর থেকে ৫ কিমি. আগে। এখানে Toy Train 360^0 turn নিয়েছে এটা সবচেয়ে বড় সার্কেল এই লাইনে এখান থেকে কাঞ্চনজঙঘা পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সাহসী যোদ্ধা দেব স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে রয়েছে একটি স্ট্যাচু।

খাওয়া দাওয়া সেরে কালিম্পং রওনা হই বিকাল নাগাদ সেখানে পৌঁছি, প্রথমেই থানার সঙ্গে যোগাযোগ করি থাকবার ব্যবস্থা হয় অঞ্জলী হোটেলে, আর সী মিস্ত্রী রোড, শহরের দঃ পূর্বে কোনে। ফোন (০৩৫৫২) ২৫৭৯৭৯৫, মো. ৯৮৩০২৯২০৯৯। সন্ধ্যায় চলে যাই মঙ্গল ধাম। এটা এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দির। গুরু মঙ্গল দাসজী মহারাজের স্মৃতি রক্ষার্থে এ মন্দির তৈরি হয়। নীচের তলায় তার 'সমাধি' রয়েছে। উপরে মন্দির ও প্রার্থনা গৃহ। ২ একর জায়গা নিয়ে এ মন্দির।

পরদিন ১৮ই জুন ভোরে ৯টায় হোটেল ত্যাগ করি — কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি দেখার জন্য।

প্রথমে যাই দেওল পার্ক — ৪ টাকার টিকিট করে ভিতরে যাই। এখানে

রাস্তার পাশে পার্কে থরে থরে রঙ বে-রঙের ফুল আমাকে মুগ্ধ করেছে। পার্কের মাঝে টুওরিস্ট গেস্ট হাউস রয়েছে — ডবল সিট (এসি) ১৫০০ টাকা আলাদা ২৫০ টাকা। সেখান থেকে পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করা যায় — অবশ্য মেঘে চারিদিক অন্ধকার — মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে যতটুকু দেখা যায়। পর্বত এই পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে হয় — কোথাও উঁচু রাস্তা কোথাও সিঁড়ি। দেওল পার্ক এর উচ্চতা ৫৫০০ ফিট কালিম্পং এর সর্বোচ্চ স্থান। সেখানে চারিদিকে পাহাড় ও শহরের মনোরম দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য। দেওল পাহাড় থেকে কালিম্পং শহরের দৃশ্য একদিকে রয়েছে শহর, রেলিং উপত্যকা অপর দিকে রয়েছে তিস্তা নদী, তিস্তা উপত্যকা, পশ্চিমে সিকিমের পর্বতমালা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখানে কাঞ্চনজঙঘার দৃশ্য সত্যিই রোমাঞ্চকর। তারপর বাইরে এসে দেখি আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে বচসা হচ্ছে unauthorisedর জন্য, এখানে local গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করা বাধ্যতামূলক। অবশেষে প্রসেনজিৎ ৭০ টাকা দিয়ে রফা করেছে। সেখান থেকে শহরে আসি। দূরবিন ধারা ভিউ পয়েন্ট যাওয়ার জন্য। প্রধান রাস্তা বিসি রোড হয়ে শহরের মাঝ দিয়ে পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। তাছাড়া শহরের মাঝখানে কালিম্পং বাজার। এক কিমি. জুড়ে মেন রোডের উভয় পার্শ্বে এই বাজার। বাজার বিসি রোড হয়ে আর সী মিস্ত্রী রোড পর্যন্ত বিস্তৃত বাজার থেকে উত্তর দিকে রয়েছে দেওল হিল এর ঠিক দক্ষিণে রয়েছে দূরবিন ধারা ভিউ পয়েন্ট, শহর থেকে দেওল হিল দূরত্ব ১০ কিমি. উত্তরে এবং দূরবিন পয়েন্টের দূরত্ব প্রায় ১০ কিমি. দেওল হিল থেকে আসতে পথে বাঁদিকে পড়েছে ডাঃ গ্রাহম হাউস।

উনবিংশ শতকে স্কটিশ মিশনারী ডাঃ গ্রাহাম কালিম্পং এ আসেন ধর্ম প্রচারক হিসাবে তিনি সারা জীবন খৃষ্ট ধর্ম প্রচার ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্কুল স্থাপন করেছেন। Orphge cum school দরিদ্র অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে মেয়েদের জন্য। ৪০০ একর জায়গা নিয়ে এই স্কুল। তাছাড়া ১৯০০ খ্রীঃ তিনি St. Andrew Colonial House প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের এক পাশে রয়েছে তিস্তা নদী ও তিস্তা উপত্যকা। এই বিদ্যালয়ের শিল্পকলা, কারু কার্য ও পরিবেশ ইউরোপীয়ান স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তারপর ত্রিপাই বাজার হয়ে ডান দিকে সরকারি হাসপাতাল ও বাঁদিকে শহীদ স্মারক রেখে ত্রিপাই রোড ধরে তারপর বিসি রোড

ধরে শহরে প্রবেশ করি। এখান থেকে ১০ কিমি. দক্ষিণে দূরবিন ধারা ভিউ পয়েন্টে যাব। প্রায় ১১টা নাগাদ আমরা দূরবিন ধারা ভিউ পয়েন্ট পৌঁছি। শহর থেকে ইষ্ট মেন রোড ধরে দক্ষিণে দেব চক হয়ে দূরবিন পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছি। এখান থেকে তিস্তা নদী ও তিস্তা উপত্যকা ও তার আশে পাশের মেঘে ডাকা পাহাড়ের দৃশ্য ভুলবার নয়। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় monestry এখানে তৈরি হয়েছিল ১৯৭৬ সালে দালাই লামা কর্তৃক। ১৩৭২ খ্রীঃ উঁচুতে দূরবিন হিলে এই Monastry অবস্থিত। দালাইলামা এই Monastry তে ১০৮ Volume "The Kangyur" দান করেছেন। এই মনাস্টির উপর তলা থেকে কালিম্পং শহরের magestic view এবং কাঞ্চনজঙঘা ও তার পাশের পর্বতশৃঙ্গের Panasonic কখনোই ভুলবার নয়। Zink Dhok Palri Podang belong to the yellow Hat sect of Budhism (Gelopa Sect) to which the present Dalailama Belongs. সেখান থেকে নেমে নীচে resturant আমরা দোসা খাই।

তারপর জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই eastern by pass দিয়ে। পথে তিস্তা নদীর উপর British স্থাপত্য নিদর্শন, Coronation Bridge দেখবার জন্য নেমে পড়া। বদহজম হওয়ার কারণে শরীর হঠাৎ অসুস্থ্য বোধ করলাম। এখানে ২বার বমি হওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি পেলাম। এখান থেকে মুং পুং দিয়ে যাওয়ার রাস্তা ৮/১০ কিমি. তারপর eastern by pass ধরে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নিউজলপাইগুড়ি শহর দুটো ঘুরে দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা আর হলো না। পথে একটা হোটেলে সবাই দুপুরের খাওয়া সেরে নিল। আমি কিছু খাইনি। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ ৫টায় জলপাইগুড়ি পৌঁছি। রাত্রে কিছুই খাইনি।

পরদিন ১৯শে জুন—মোটামুটি সুস্থ বোধ করছি। মেয়েকে ফোনে খবর জানানো হল। চেষ্টা করেও ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। সেদিনে বিশ্রাম নিলাম। বিকালে হোমিওপ্যাথি ঔষধ নিলাম। ২০শে জুন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শারীরিক অবস্থা। বিকালে ২ জন তিস্তা উদ্যান দেখতে যাই — ৬ টাকা রিক্সা ভাড়া ৩/৪ কিমি. রাস্তা। ভালই লাগল। ছোট জলাশয়ের মাঝে একটি ছোট জাহাজ বাড়ি, তার আশে পাশে জলাশয়ে নৌকা নিয়ে ঘুরছি (১৫মি. ৭

টাকায়) সেখানে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ছোটো স্প্রাইট নিয়ে বসে বসে খেলাম—আর জলাশয়ে পর্যটকদের নৌকা বিহার দেখালাম। ৭টায় বেড়িয়ে আসলাম। চায়ের সন্ধ্যন করলাম পাওয়া গেল না। স্ত্রী আরতী চাট খেয়ে চায়ের পিপাসা মিটাল। এ অঞ্চলটি শহরের অপর প্রান্তে। উল্টো দিকে ডি এম অফিস ও বাংলা। তারপর একটু হেঁটে হসপিটাল রোড পড়ি। এস টি ডি বুথে গিয়ে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু পাইনি। তারপর ৮ টাকা দিয়ে একটি রিক্সা নিই, পরে দিন বাজার থেকে ২টা ভ্যান নেই, সন্ধ্যা ৮টায় বাড়িতে পৌঁছি। পরদিন ২১শে জুন তিস্তা তোর্সা পৌঁছে কলকাতা যাচ্ছি — ১.৪৫ মি. জলপাইগুড়ি থেকে। ভোরে বৃষ্টি থাকায় কোথাও বেড়াতে যাইনি। সন্ধ্যায় আশে পাশে ঘুরে বেড়াই। Eye Foundation পড়ে Bridge এর ওপারে হোমিও Dr. S. Dasgupta'র কাছ থেকে ঔষধ সংগ্রহ করি।

পরদিন ২২শে জুন যাওয়ার জন্য লাগেজ সুটকেস ইত্যাদি রেডি করে স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে নেই। পরে ১২টা নাগাদ বেরিয়ে যাই। প্রসেনজিৎকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে যাই। তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস এ পরদিন ভোর ৬টা নাগাদ শিয়ালদহে পৌঁছি। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তেঘরিয়া হয়ে অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স-এর ফ্ল্যাট-এ ফিরে আসি।

তমলুক সফর

২২শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটিতে আমি সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলাম। কোলাঘাট আমার মেয়ের শ্বশুর বাড়ি।

২২শে ডিসেম্বর ভোর ১২টা নাগাদ গাড়ি আসে। আমার মেয়ে ও জামাতা সঙ্গে নাতি অনিষ্ককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তমলুকের উদ্দেশ্যে। কোলাঘাট থেকে তমলুকের দূরত্ব ৩০/৪০ কিমি.।

আমরা ১২টা নাগাদ তমলুক শহরে পৌঁছে গেলাম। এখানে তমলুকের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া গেল। তাম্রলিপ্ত — তমলুক এর ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার গৌরবময় ভূমিকা সর্বজন বিদিত। বৃহত্তর জেলা মেদিনীপুর বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত — পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর। তমলুক পূর্ব মেদিনীপুরের ডিস্টিক শহর। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের তাম্রলিপ্ত তথা মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস নব প্রস্তর যুগ ও তাম্র্য প্রস্তর যুগের প্রত্নবস্তুর আলোক বিশেষ সমৃদ্ধ। তার বিভিন্ন প্রত্ন সামগ্রী সংগৃহীত হয়ে, সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত আছে।

প্রত্নক্ষেত্র রূপে মেদিনীপুরের প্রাচীনত্ব সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রাক্ ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক যুগে সম্প্রসারিত। মেদিনীপুরের সুপ্রাচীন প্রত্নক্ষেত্রগুলি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের পক্ষে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু হয়। আবিষ্কৃত হয় প্রাগঐতিহাসিক মানুষের মৎস্য শিকারের জন্য ব্যবহৃত হরিণের শিং ও পশুর হাড় থেকে তৈরি হারপুর, হাড়ের তৈরি বৃহদাকার বড়শী, পশুর চোয়াল কেটে তৈরি 'শস্যছেদক', তামার তৈরি বঁড়শী ইত্যাদি। এইসব আবিষ্কার তমলুকের প্রাচীনত্বকে স্বীকৃতি দেয়। তমলুক শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নবাশ্মীয় ও তাম্রশ্মীয় (মধ্য প্রস্তর যুগ ও তাম্র প্রস্তর যুগের) প্রত্ন বস্তুর আলোকে একথা অনুমান করা যায় যে তমলুক প্রাচীনতম মানব সংস্কৃতি ঘটেছিল এই প্রাগঐতিহাসিক পর্বে।

দেবী বর্গভীমা — তমলুক

১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বার ভারতীয় পুরাতত্ত্ব দপ্তর খনন কাজ করে লাল জল ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল ঝাড়গ্রাম, রানিপাহাড়, শ্রীনাথপুর, জবলা, কাঁকড়া ঝোড়, আগুইবনি, ঘাঘরা বুড়ি পোড় ইত্যাদি গ্রামে। এসব অঞ্চল থেকে আদি প্রস্তর, নব্য প্রস্তর ও তাম্রযুগের বহু প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। আদিম মানুষের আবাসস্থল একটি গুহার আবিষ্কার সবচেয়ে বিস্ময়কর। লালজল গ্রামের দেব পাহাড়েই রয়েছে এই আবিষ্কৃত গুহা। এই গুহার নিম্ন অংশ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে, একটি পাথরের তৈরি কবর। এই কবরের বাক্সে পাওয়া গেছে মানুষের হাড় গোড়া ও হোলার বর্শার কণা ভগ্ন মৃৎপাত্র ও পোড়া হাড় ইত্যাদি। এগুলি মহা প্রস্তর যুগের কৃষ্টির নিদর্শন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল একটি বর্ধিত শিলাখণ্ডের দেওয়ালে গো জাতীয় প্রাণীর শিলা চিত্র। আরো লক্ষণীয় বিষয় হল যে ভারতবর্ষে কোথাও হাড় ও হরিণ এর শিংকে শিল্পের হিসাবে ব্যবহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ জাতীয় নিদর্শন প্রধানতঃ ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স ও পূর্ব রাশিয়ার প্রাগ ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব থেকে পাওয়া গেছে। এদের অস্তিত্ব মোটামুটি খৃষ্ট পূর্ব ত্রিশ হাজার থেকে দশ হাজার অব্দের মধ্যে পাওয়া গেছে। এই সব আবিষ্কার থেকে এটা অনুমিত হয় যে আলোচ্য শিল্প প্রদর্শনীর বয়সকাল অন্তত পক্ষে নবাশ্মীয় ও তাম্রশ্মীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী। সিজুরায় প্রাপ্ত প্রাগঐতিহাসিক মানুষের জীবাশ্ম এবং নাটলালে প্রাপ্ত হাড় ও হরিণ শিং-এর অস্ত্রশস্ত্র শিল্প সামগ্রীর প্রাপ্তি থেকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে প্রত্নক্ষেত্রে তথা আদি মানুষের বসতির ক্ষেত্র রূপে মেদিনীপুরের প্রাচীনত্বকে কেবল প্রাগঐতিহাসিক যুগে নয় আরো অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। মেদিনীপুরবাসী তাদের এই সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্যের জন্য গর্ব বোধ করতে পারে। তমলুকে আবিষ্কৃত সেই অজ্ঞাত যুগের কলসদ্বয় এর গঠন ভঙ্গি এবং শৈল্পিক কারুকার্য প্রাচীন মিশর ক্রীট দ্বীপ ও গ্রীস দেশের মাইসেনের কলা রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য তাম্রলিপ্তের ইতিহাসকে এক বৃহত্তর পরিসর দানে সক্ষম হয়েছে। আবিষ্কৃত পোড়ামাটির মনুষ্যমূর্তির সঙ্গে সুদূর আমেরিকার আজটেক মূর্তির মিল চোখে পড়ে। এসব ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, গৌরবাজ্জ্বল দিনের কথা।

পৃথিবীর আদি সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নদী তীরবর্তী

অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে। রূপনারায়ণ নদীর তীরে সম্ভবত একই কারণে সুপ্রাচীনকালে সিন্ধু সভ্যতার মতো এক উন্নত ধরণের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

বাংলার এই অঞ্চলে প্রাগঐতিহাসিক প্রত্নস্থলের অধিবাসী কারা? যতদূর জানা যায় প্রাচীনতম অধিবাসীরা অন্য ধৃত বা ব্রাত্য নামে পরিচিত ছিল। তারা দীর্ঘ মস্তক বিশিষ্ট অনার্য ও কৃষ্ণ বর্ণের ছিল তা বৌধায়নের ধর্ম সূত্র থেকে জানা যায়। নৃতত্ত্বীদরা এদেরকে প্রটো অস্ট্রোলয়েড (নিষাদ জাতি) দ্রাবিড়ীয় ও আলপাইল বলে পরিচিত। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক, দাবিড় ইত্যাদি। যাদের বংশধারা হন্দ্র সাঁওতাল, বাড়বী, বাগদী, শবর, লোধা, কোড়া, খড়িয়া, মহালী, ডোম, মুন্ডা ইত্যাদি বহু উপজাতি ও কোষ। এরাই হল প্রাক-আর্য্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মেদিনীপুর জেলায় আজ এরা জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশরূপে বসবাস করে চলেছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে তাম্রলিপ্ত তথা মেদিনীপুরের প্রাগ ঐতিহাসিক সভ্যতার স্রষ্ঠা ছিল প্রাক্-আর্য প্রটো-অস্ট্রোলয়েড শ্রেণির যে কোন শাখা বা দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী কোন জাতি।

শহরে পৌঁছে প্রথমে ইতিহাস ও কিংবদন্তিতে ঘেরা দেবী বর্গভীমার মন্দিরে যাই।

বাংলাদেশে যে কয়টি মন্দির স্বমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাদের অন্যতম হল দেবী বর্গভীমা মন্দির। এটি জাগ্রত দেবতা এ অঞ্চলে এ দেবীর জনপ্রিয়তা ও সাহিত্য সর্বজন বিদিত। দেবী বর্গভীমার ইতিহাসের উপর নানা ধরণের কিংবদন্তি প্রচলিত— প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগে।

প্রাচীন যুগের কিংবদন্তি প্রসঙ্গে—

১। মহাভারতের যুগে তাম্রলিপ্তে যখন ময়ূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন তখন ঐ বংশের দ্বিতীয় রাজা তাম্র ঋজের নিয়োজিত এক জেলে বৌ প্রত্যহ রাজ পরিবারে মাছ সরবরাহ করত। একদিন বনের মধ্য দিয়া মাছের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়িতে আসার পথে সে একটি ছোট জলে ভরা গর্ত দেখতে পায়। জেলে বৌ স্বভাব বশত সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাছের ঝুড়িতে দেয়। আশ্চর্যের

ঘটনা হল জল ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির মরা মাছগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক ঘটনা রাজার কানে গেলে, রাজা জেলে বৌ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। জলে ভরা গর্তের জায়গায় একটি বেদি ও তার উপর দেবী মূর্তি দেখতে পান। রাজা তাম্রধ্বজ সেই দৃশ্য দেখে সেখানে দেবী পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই দেবীই বর্গ ভীমা নামে পরিচিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছে।

২। ময়ূর বংশের চতুর্থ রাজা গরুড় ধ্বজ প্রত্যহ শোলমাছ খেতেন। একজন জেলে তা সরবরাহ করত। একদিন পথে শোল মাছ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায়, রাজা তাকে মৃত্যু দন্ডের আদেশ দেন। জেলে কোন রকমে জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে দেবী বর্গ ভীমার কৃপা লাভ করে। দেবী তাকে যত বেশী সম্ভব শোল মাছ জোগাড় করে শুকিয়ে রাখার উপদেশ দিলেন এবং শুকনো শোল মাছ প্রত্যহ রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেবী কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি কুয়া থেকে জল ছিটালেই মরা মাছ বেঁচে উঠবে। জেলে তাই করতে শুরু করে এবং রাজার কাছে সময়ে অসময়ে শোল মাছের যোগান দেওয়ার আর কোন অসুবিধা হয় না। এদিকে রাজার সন্দেহ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জেলের কাছ থেকে সেই অলৌকিক কুয়ার সন্ধান লাভ করেন। দেবী জেলের অলক্ষ্যে তারই গৃহে অবস্থান করেছিলেন। রাজাকে সেই অলৌকিক কুয়ার সন্ধান দিতে গেলে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে জেলের বাড়ি ত্যাগ করে গিয়ে একটি পাথরের মূর্তির প্রতীকে কুয়ার মুখে অবস্থান করলেন যাতে কুয়াটি দেখা না যায়। জেলে যখন রাজাকে নিয়ে কুয়ার কাছে গেলেন — তখন কুয়ার বদলে দেখলেন এক দেবী মূর্তি। এই সেই আলোচ্য দেবী বর্গ ভীমা।

৩। দক্ষ যজ্ঞের সময় থেকে দেবী বর্গ ভীমা এখানে পূজিত হয়ে আসছে। বিশ্বাস, শিব পত্নী সতীর বাম গুলফ এখানে পড়ায় সেই থেকে এটি একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম বলে চিহ্নিত, এবং দেবী বর্গ ভীমা এই পীঠের আরাধ্যা দেবী। দেবীর সেবায়েত পরিবার ও পুরোহিতরা এই কিংবদন্তির কথা ভক্তদের বলেন। মধ্যযুগের কিংবদন্তিগুলি দেবীর আবির্ভাব ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত।

১) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগর এক সময় রূপনারায়ণের উপর দিয়ে বাণিজ্য তরী নিয়ে সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য করতে যান। তমলুকে

নোঙ্গর করে সেখানে অবস্থানকালে তিনি দেখেন একজন লোক সোনার কলসি নিয়ে যাচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে তিনি জানতে চান, কোথা থেকে সেটি পেয়েছেন। লোকটি তখন একটি বিস্ময়কর কাহিনী তুলে ধরেন। বললেন জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক কুয়া রয়েছে, সেখানকার জলে পেতলের পাত্র ডোবালেই তা সোনার পাত্র হয়ে যায়। ব্যবসায়ী ধনপতি লোকটির কাছ থেকে সেই কুয়ার সন্ধান নিলেন। তারপর তিনি তমলুক বাজারে যত পেতলের পাত্র ছিল তা কিনে নিলেন। কুয়ার জলে সেগুলি ডোবাতে হাতে হাতে ফল পেয়ে গেলেন। সব পাত্রই সোনার হয়ে গেল। সেই সব পাত্র সঙ্গে নিয়ে সিংহল যাত্রা করলেন। সেই সব পাত্র বিক্রি করে প্রচুর অর্থলাভ করেন যাহা তিনি কখনও কল্পনা করতে পারেননি। ফেরার পথে তমলুকে বাণিজ্য তরী থামালেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই কুয়ার উপর তিনি বর্গভীমা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মূর্তি স্থাপন করলেন। অনেকের বিশ্বাস সেই মন্দিরটি হল বর্তমানের বর্গভীমা মন্দির। মার্কেন্ডেয় পুরাণে আছে দেবী বর্গভীমার উল্লেখ। দেবী পুরাণে ও উল্লিখিত রয়েছে—

"কপালিনীরূপে বামগুলফ

বিভাসকে।

ভৈরবশ্চ মহানন্দ সর্বানন্দঃ

শুভ প্রদ

ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে

দ্রাবিংশ অধ্যায়ে,

তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা

বিরাজতে

গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী

সুরধনী তটে।"

তমলুকের শক্তিপীঠ এই তীর্থের প্রাচীন নাম বিভাস। দেবী এখানে বর্গভীমা বা ভীমরূপা নামে অধিষ্ঠিত। ভৈরব সর্বানন্দ মতান্তরে রুপালী। মহামায়া সতীর দেহাদেশের মধ্যে বামগুল্ফ বা পায়ের গোড়ালী পড়েছিল এখানে। বিভাসে দেবীমূর্তি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে।

২) দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দির তমলুকের কৈবর্ত্ত রাজ পরিবারে কালু মিঞা কর্তৃক দেবী বর্গ ভীমার পূজার প্রচলন তথা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

৩) ভূরিশ্রেষ্ঠের (হুগলী জেলা) ব্রাহ্মণ রাজবংশের অষ্টম পুরুষ রাজা শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের ভাই শ্রীমন্ত নারায়ণ কর্তৃক দেবী বর্গ ভীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, ষোড়শ শতাব্দীতে।

কৈবর্ত্ত রাজপবিবার সওদাগর পরিবার ও ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ জল দেবী পূজার ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনি সঙ্গে যুক্ত। একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দির মধ্যে নিম্ন বর্গের মানুষের কল্পনায় সৃষ্ঠ দেবী বর্গ ভীমা সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় দেবী বর্গ ভীমা প্রথমে সমাজের সাধারণ (নিম্নবর্গের) মানুষের মধ্যে পূজা পান, তারপর ক্রমে ক্রমে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা পূজা করতে শুরু করেন। জেলে সম্প্রদায়ের দ্বারা শুরু, তারপর ক্রমে ক্রমে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা পূজা করতে শুরু করেন। তারপর কৈবর্ত্তরাজ ও বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং সর্বশেষে ব্রাহ্মণ পরিবার কর্ত্তৃক পূজিত হয়। দেবী বর্গ ভীমা কালকের একরূপ ভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা মন্দিরের পথে পৌঁছে অবাক বিস্ময়ে দেখছি মন্দিরটির গঠনশৈলী। রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিম তীরে শহরের পাশেই অবস্থিত।

খুব উঁচু বুনিয়াদের উপর তিন ভাজ দেওয়ালের উপর মূল মন্দিরটি তৈরি করা হয়। প্রথমতঃ বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সমস্ত মন্দির এলাকার মাটির উপর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ইট ও পাথর দিয়ে গেঁথে ৩০ ফুট উঁচু বুনিয়াদ তৈরি করা হয় এবং এরই উপর মন্দিরের দেয়ালের অবস্থিতি। তিনটি পৃথক দেওয়ালের সমষ্টিতে মন্দিরের পূর্ণ দেওয়াল হয়েছে। পূর্ণ দেওয়ালের মাঝে পাথরের দেওয়াল

এবং ভিতরে ও বাহরে ইটের দেওয়াল। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। দেওয়ালের ভিতরে প্রস্থ ৯ ফুট। মন্দিরটি গোল ছাদ বিশিষ্ট। এই মন্দিরের গঠন শৈলী দেখে বোধ করি তমলুকের মানুষেরা আজ ও গর্ব করে বলে থাকেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা স্বয়ং এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

এই পশ্চিমমুখী মন্দিরটির চারটি বিশিষ্ট অংশ রয়েছে। মূল মন্দিরে যেখানে দেবী বর্গ ভীমা সহ অন্যান্য দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি রয়েছে "জগমোহন" অর্থাৎ এখান থেকে দর্শকরা দেবীকে দর্শন ও ভক্তি করেন। তার সামনে যজ্ঞ মন্দির এবং প্রশস্ত নাটমন্দির, মন্দিরের দক্ষিণ দিকে তিনটি ঘর রয়েছে — মায়ের ভোগের ব্যবস্থা, প্রসাদ গ্রহণের কক্ষ ও পুরোহিতদের থাকবার ব্যবস্থা

মন্দিরের সামনে উত্তর দিকে রয়েছে মায়ের কুন্ড। সেখানে একটি গুলঞ্চ গাছ রয়েছে — বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় এই গাছটিকে পূজা করে থাকেন। আমরা যথারীতি মন্দিরের গর্ভ কক্ষে প্রবেশ করে ভোগ দিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করি। মন্দিরের শান্ত পরিবেশ ও নিয়ম শৃঙ্খলা লক্ষণীয়। দেবী বর্গ ভীমার স্থান জন মানসে অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে — তা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন ও দেবীর কাছে মানত করা থেকে বুঝা যায়। বিভিন্ন মনকামনা নিয়ে বহু উচ্চ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারী দেবীর শরণাপন্ন হন। সাধারণতঃ সন্তান কামনা, মৃতবৎসা জননীর দীর্ঘায়ু সন্তান কামনা, কন্যা সন্তানের জননীরা পুত্র সন্তান কামনায়, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে, পরীক্ষায় সাফল্য, মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরি প্রাপ্তি ইত্যাদি কামনা পূরণের জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দেবীর শরণাপন্ন হন।

এবার ফেরার পথে তমলুকের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখি। ২টা নাগাদ ফিরে আসি।

কোলাঘাট হয়ে হলদিয়া

আজ বড়দিন ২০০৪। ১২টায় ট্যাক্সি নিয়ে আমরা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোলাঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সঙ্গে রয়েছে মেয়ে সুস্মিতা, জামাতা অনিত ও নাতি অনিশ্‌ক। রাস্তা জ্যাম থাকায় ৪টা নাগাদ কোলাঘাট এসে পৌঁছি। তিনতলা বাড়ির আর বেয়াই অনিল দাশ ও বেয়াইন ইরাদেবীর চার ছেলে ও এক মেয়ে। সবাই বিবাহিতা সেজ ছেলে অনিত আমার জামাতা। বড় ছেলে অসিত ও মেজ ছেলে অমিতের পরিবার, নাতি-নাতনি নিয়ে আমার বেয়াই বেয়াইনের সুখি পরিবার। অসিত বড় ছেলে হলদিয়ায় মিলন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। মেজ ছেলে অমিত বাগনান বীর শিবপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অবশ্য নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দুজনেই বাড়ি করে নিয়েছে। ছোট ছেলে অতীত দিল্লিতে আছে সপরিবারে।

আমার বেয়াই অনিল দাশ ও বেয়াইন ইরাদেবী দুইজনেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯৫ সালে চাকরিতে অবসর নেন। কোন ইউনিয়নের সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে। ইরাদেবী সেই স্কুলের প্রাইমারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে অবসর নেন ২০০২ সালে। বড় বৌ দুর্গা স্থানীয় সত্যানন্দ আশ্রম স্কুলের শিক্ষিকা। দুই বৌ ও চার নাতি, নাতনি নিয়ে আমার বেয়াই মহাশয়ের সংসার একটা যৌথ পরিবার সুন্দর ও সুশৃঙ্খল—একান্নবর্তী পরিবার। আমার প্রশ্ন আর কত দিন? বিচ্ছিন্নতার প্রস্তুতি চলছে। হয়ত একদিন এই বেয়াই বেয়াইন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। যেমনটি আমরা ২ জন। অবশ্য আমার ছেলেমেয়ে দুইজনই রয়েছে কাছাকাছি—অনুপমা কমপ্লেক্স ও তেঘরিয়া। এই প্রথম বেয়াই মহাশয়ের বাড়িতে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কয়েক দিনের — বড়দিনের ছুটিতে। দোতলার একটি ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। যত্ন আত্তির কোন ত্রুটি নেই। বিশেষ করে বড় বৌ দুর্গা দেবী সব সময় খোঁজখবর নিচ্ছেন। পরদিন ২৬ ডিসেম্বর ভোরে চা খেয়ে ইরাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি — প্রাতঃভ্রমণে। গল্প করতে

করতে অনেক দূর চলে গেলাম — রূপনারায়ণ নদীর পাড়। বাঁধের পাশে রয়েছে ৫-৬টি ব্রিক ফিল্ড, তাছাড়া ফারনেস তৈরিতে ব্যবহৃত উচ্চমানের ইটের কারখানা। দুইধারে পিকনিকের আসর বসেছে। বড়দিনের ছুটি, বাইরে থেকেও এসেছে ছেলেমেয়েরা ছুটি কাটাতে। পিকনিকের আসর— রূপনারায়ণের নদীতে নৌকা করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে ছেলেমেয়েরা। আবার কোন দল নৌকা বিহার করছে সঙ্গে গানের আসর। এইসব দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ৯টা বেজে গেল। আমি বলি ইরাদেবীকে-চার নাতি নাতনি নিয়ে আমোদ আহ্লাদ, বৌমাদের আদর যত্নে বেশ আছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে না নতুন নাতি অনিষ্ককে নিয়ে কিছুদিন কলিকাতায় গিয়ে থাকতে। দাদু, ঠাকুরমার সঙ্গ পেতে চায় অনিক। তারও ও দাবি রয়েছে — দাদু, ঠাকুরমাকে নিয়ে আদর করতে। কেন বঞ্চিত করছেন। আমার অনুরোধ রইল কলিকাতায় আসুন। সমস্যা বেয়াই মহাশয়কে নিয়ে— বাইরে যেতে চান না। বিকাল ৪টায় আমরা দুইজন হলদিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বড় ছেলে অসিত ও দুর্গার তত্ত্বাবধানে। সেবাযত্নের ব্যাপারে অতটুকু ত্রুটি হওয়ার উপায় নেই — যেখানে দুইজন অত্যন্ত প্রহরী রয়েছে — অসিত ও দুর্গা। ৬টা নাগাদ হলদিয়া পৌঁছে যাই। মিশন বিদ্যালয়ের পাশেই অসিতের বাড়ি। সুন্দর বাংলা টাইপের বাড়ি—সুন্দর ব্যবস্থা—খুব ভালো লাগলো। আমাদের এই স্মৃতি মধুর হয়ে রইল — তাদের সেবাযত্নের জন্য — যার কোন তুলনা হয় না।

২৭ ডিসেম্বর সোমবার রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি—কাশির জন্য-নিদ্রা বিঘ্নিত হয়। নতুন জায়গা। ভোরে উঠে পড়ি ৭টায়। প্রাতঃরাশ করে বেরিয়ে পড়ি—ড. শীতান্ত দাশ ও শ্যামল চক্রবর্তীকে ফোন করতে। যাক শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পেরেছি। ডা. শীতান্তের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে —আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলাম, খুব ভাল লাগল। শীতান্ত আমাদের খুব কাছের লোক। আগরতলার বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে আমাদের বাড়ির দক্ষিণে — ডা. ফণীদাশের দ্বিতীয় ছেলে শীতান্ত — বড় ছেলেও ডাক্তার হিমাংশু আগরতলায় সরকারি ডাক্তার ছিল। কয়েক বছর হয় ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। ওখানে এখন তাদের কেউ নেই। এক মেয়ে জামাই বাড়ির অর্ধেক দখল নিয়েছে ও অবশিষ্ট সরকারকে দান করেছে — সেখানে ফণী দাশের স্মৃতিতে একটি চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র হয়েছে আমার

লেখকের বেয়াই অনিল দাশের বড়ছেলে অসিতের স্ত্রী শ্রীমতি দুর্গা — হলদিয়া

অসিত সঙ্গে অসিতের ভাই ও ছেলে — হলদিয়া

লেখকের মেয়ের শ্বশুর (অনিল দাশ) ও শাশুরী (হিরাদেবী)

এখনও তাদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ডা. হিমাংশুর স্ত্রী শিক্ষিকা ২ মেয়ে নিয়ে গান্ধিঘাটে ডা. শীতাংশু অবিবাহিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার — বদলির চাকুরি। হলদিয়া সরকারি হাসপাতালে কর্মরত থাকতেই অবসর নিয়ে হলদিয়া রয়ে গেছেন। জনগণের সেবায়। যথেষ্ট সুনাম। হলদিয়ায় খুব পরিচিত হয়েছে যথেষ্ট নাম যশ। সল্টলেকে বাড়ি করেছে। সপ্তাহে ২ দিন শনি-রবি সেখানে বসেন। তৃতীয় ছেলে দক্ষিণ কলিকাতায় মাকে নিয়ে থাকেন। সেও অবিবাহিত। এখন আগরতলায় গিয়ে ভাবি। এক সময় এ বাড়ির একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল, 'গাইনো' ডাক্তার হিসেবে ডা. ফণী দাশ। স্ত্রী রত্নাপ্রভা দাস আমাদের বিশেষ পরিচিতি। আমরা বাঙালি দলের হয়ে তিনি বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। আজ তাদের বংশধরদের কেউ নেই। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

শ্যামল চক্রবর্তীর সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ হয়। ছেলের পরীক্ষার কারণে সে সবাইকে রহড়া বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। শ্রী চক্রবর্তী, কষ্ট এবং চার্টার একাউনটেন্ট হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলে জেনারেল ম্যানেজার একাউন্টস এবং ফাইন্যান্স। প্রথম ও এন জি সি চাকরি নিয়ে আগরতলা যায়। তখন আমাদের আগরতলা চাপ্টার অব কস্ট একাউন্টস এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সহকর্মীদের নিয়ে। বিমল চক্রবর্তী ও এস সাবুই। আগরতলা চাপ্টারের শুরুতে এদের সাহায্য ও আন্তরিকতা, ভুলবার নয়। আমি চেয়ারম্যান ছিলাম। আগরতলায় তখন ক্লাস নেওয়ার মত লোক ছিল না। তখন কলকাতা থেকে ফ্যাকাল্টি এসে ক্লাস নিত, আর আমরা এই কয়জন। অবশ্য পরবর্তীকালে কিছু ছেলে এই কেন্দ্র থেকে পাশ করায় সেই সমস্যা ছিল না। দুপুরে দেড়টা নাগাদ গাড়ি আসে। মারুতি ভেন। আমরা চারজন। আমরা ২ জন, অসিত ও শ্রীমতী দুর্গা। প্রথমে আমরা যাই শহর ছাড়িয়ে গেওখালি—যেখানে ন্যাশানেল হাইওয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে, আর সেইখানেই রূপনারায়ণ হুগলি নদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থল। ৪১নং ন্যাশানাল হাইওয়ে গেওখালি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। লক্ষণীয় হল হলদিয়ার শিল্পাঞ্চল এই রাস্তার দুই পাশেই কেন্দ্রীভূত রাস্তার দুই পাশে এই উন্নয়নের ছোঁয়া ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার অবধি বিস্তার লাভ করেছে উত্তর-দক্ষিণে। এই

শিল্পোঞ্চল প্রায় ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত। উন্নয়নের গতি প্রকৃতি দেখে বোঝা যায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং বাণিজ্যিক কুশলতার ছাপ রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা গেওখালি পৌঁছে — সেখানে আধ ঘণ্টা ধরে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। ডান দিকে বিস্তৃত জলরাশি সেখানে রূপনারায়ণ ও হুগলি নদী এসে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। ওপারে (রূপনারায়ণের) গাদিয়ারা। গাদিয়ারা এবং নূরপুরের মাঝখান দিয়ে কলিকাতা থেকে হুগলি নদী এসে রূপনারায়ণ গ্রাস করে বঙ্গোপসাগরে লিন হয়েছে। রাস্তার পাশে জলের ধারে একটা সুন্দর পার্ক রয়েছে। বিভিন্ন ফুলের সম্ভার নিয়ে ভ্রমণকারীদের মনোরঞ্জনের জন্য। আরেকটি লক্ষণীয় জিনিস আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। রাস্তার ও ধারে রয়েছে একটা হলুদ রঙের দোতালা বাড়ি তার উপরে উড়ছে লাল রঙ্গা পতাকা। ঘোষণা দিচ্ছে সি পি এম এর জয় জয়কার। বাঁদিকে রয়েছে অসংখ্য পিকনিক স্পট গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাশে ৮-১০টি লেক। সবসময় পরিপূর্ণ নদীর জলে। অপূর্ব পরিবেশ পিকনিকের জন্য। এ সময় বড় দিনের ছুটি থাকায় — জায়গায় চঞ্চলতা বেড়ে গেছে। বহু দূর দূরান্ত এমনকি কলকাতা থেকেও দলে দলে লোক এসেছে পিকনিক করতে। তাছাড়া হলদিয়া টাউনশিপ যাওয়ার পথে ৪-৫ কিলোমিটার আগে হলদি নদীর ধারে পিকনিক স্পট রয়েছে। সেখান থেকে আমরা ডক এরিয়ায় গেলাম। কুকুরাহাটি জেটি। একটা ভি আই পি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আমরা অনুমতি নিয়ে ভেতরে গেলাম। দেখলাম কি সুন্দর ব্যবস্থা। কর্মকর্তাদের একজন বলল —·এই লঞ্চে ইন্দিরা গান্ধি এই অঞ্চল পরিদর্শন করেছে। তাছাড়া জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সেদিন এই লঞ্চে করে এই অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। তারপর আমরা যাই হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলে। আমার বন্ধু শ্যামল চক্রবর্তী ভোরে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের আসার সময়। এইচ পি সি এল এর গেটে গিয়ে খবর পাঠাতেই গাড়ি পাঠিয়ে দিল। আমাদের গাড়ি নিয়ে প্রবেশের অনুমতি নেই। তারপর সিকিউরিটি আমাদের কিছু সতর্ক বাণী দিয়ে প্রত্যেকের বুকে ভিজিটরস কার্ড লাগিয়ে দিল। খাতায় নাম লিখে একটি শ্লিপ নিলাম। সেটি আবার যার সঙ্গে দেখা করব তার সই নিয়ে ফেরার পথে জমা দিতে হয়। আমরা যথারীতি কোম্পানির গাড়িতে গিয়ে বসিয়ে

প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে অফিসে নিয়ে গেল। ১৬ বছর পর দেখা অবশ্য টেলিফোনে ও চিঠি পত্রে যোগাযোগ ছিল। অনেক দিন বাদে দেখা কিছুটা উচ্ছাস ও কিছুটা আন্তরিক কথাবার্তার বিনিময় হল। আগরতলা চাপ্টারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়লাম খেয়াল নেই সময়ের। দেখি রাত ৮টা। সেখান থেকে বেরিয়ে হলদি নদী অন্ধকার মাঝে মাঝে এখানে সেখানে আলোর ছটা। তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। কিছু লোকের এখানে সেখানে জটলা আর নৌকা বিহার করছে ছেলেমেয়েরা। ফিরে আসি ৮টা নাগাদ। ১০টায় ডাঃ শীতান্ত এল। ডা. ফণী দাশের বাড়ির কে কোথায় আছে। কেমন আছে, যারা সব হারিয়ে গেছে আগরতলায় পুরানো স্মৃতি নিয়ে। কিছু অনুশোচনা কিছুটা বিষণ্নতা নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। পরদিন ২ দিনের সফর শেষ করে ফিরে আসি।

আসাম সফরে — কামাক্ষ্যা মন্দির

১৯৫৫ সাল পূজার ছুটি। পরিকল্পনা নিয়েছি বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর আগ্রহে — তাদের সঙ্গী হয়ে যাব শিব সাগর, বন্ধুর শ্বশুরালয়ে। বন্ধুটি হারাধন বর্দ্ধন— উমাকান্ত স্কুলের হিন্দি শিক্ষক। ত্রিপুরায় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মী হিসাবে একটি বিশেষ পরিচিতি ছিল। তা ছাড়া ক্ষিরোদ দাদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই সূত্রে তখন থেকে হাবাধন বর্দ্ধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আমি এক সময় কংগ্রেস অফিসে হিন্দি শিক্ষার ক্লাসে যোগ দেই। ওয়াধা হিন্দি বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে "কৌবিদ" পাশ করি। ঐ ভাবে হারাধন বর্দ্ধনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অনেক দিনের। সেই সূত্রে এই আমন্ত্রণ, পাশপোর্ট করে নিয়েছি পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট হয়ে শিলচব-যাব, সেখান থেকে গুয়াহাটি হয়ে শিবসাগর।

সস্ত্রীক বর্দ্ধন ও আমি আগরতলা চেক পোস্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ি সিলেটেব উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ডাউকি হয়ে শিলং। সন্ধ্যা নাগাদ শিলং পৌঁছে যাই যতদূর মনে পড়ে হোটেল পাইন ভিউতে ছিলাম। মোটামুটি সব ব্যবস্থা, গরম জল ইত্যাদি রয়েছে। যথেষ্ট শীত। অষ্টমী পূজা চারিদিকে একটি খুশির আয়োজন। আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলে কিছু দূরে রয়েছে — পুলিশ বাজার। দুর্গা পূজার বিশাল আয়োজন — পূজা প্যান্ডেলে পাশে বিশাল স্টেজ - সেখানে যাত্রা ও নানাবিধ অনুষ্ঠান চলবে এই তিন দিন। এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রতি দুর্গা মন্ডপের পাশেই রয়েছে যাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

মেঘালয় এর রাজধানী শিলং। মেঘের আলয় তাই মেঘালয়। শিলং আসতে ডাইকির পথে মেঘের খেলার অপূর্ব সমারোহ-কখনও সামনে ডাইনে বাঁয়ে— আধোঁ আলো আধারে — গাড়ি সন্তর্পণে শিলং পথে এগিয়ে চলেছে। এ দৃশ্য ভুলবার নয়।

আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৭২ সালে ২১শে জানুয়ারি মেঘালয় ভারতেব ২১তম রাজ্য হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। এ রাজ্যে রয়েছে পাইন, অজানা গুল্ম

লতা, অর্কিড সমারোহ। মূলত পাহাড়ি চরিত্রের এ রাজ্যটি উত্তরে পূর্বে আসাম দক্ষিণ ও পশ্চিম ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ গারো, খাসি জয়ন্তীয়া তিনটি অঞ্চলের সাতটি জেলা নিয়ে গঠিত এই রাজ্যের আয়তন ২২৪২ বর্গ কিমি. গড় উচ্চতা ১২০০-১৯৬৫ মিটার এখানকার অন্যতম আকর্ষণ ঢেউ খেলানো পাহাড় সবুজ উপত্যকা নদী জল প্রপাত সহ উদ্ভিদ উপজাতি গোষ্ঠী।

পরদিন আমরা বিডন ও বিশপ ফলস্ দেখতে গেলাম শহর থেকে একটু দূরে। এই দুটি জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে সমস্ত শহরকে আলোকিত করছে। আমরা নীচে যাই খুব সাধারণ ব্যবস্থা একটা টিনে ঘরে। একটা (Vertical magnet) প্রচন্ড বেগে ঘুরছে — তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। খবর নিয়ে জানলাম উপরে একটি জলাশয় রয়েছে। সেখানে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। জল প্রপাত দুটিতে ১০০ ফুট উপর থেকে জল ধারা নেমে আসছে। খরার সময় জলের অভাবের জন্য জলাশয়ের নীচে থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হয় — সাধারণত যখন বিদ্যুতের চাহিদা শহরে কম। কত সহজ ও সাধারণ ব্যবস্থা। আমি আরো জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখেছি এত অল্প ব্যয়ে সুন্দর ব্যবস্থা আমার চোখে পড়েনি।

ফেরার পথে শিলং বিদ্যুৎ গল্ফ কোর্স ও বিধান ভবন দেখে নিলাম।

পরদিন দুপুরে খাওয়া সেরে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সময় নেবে সাড়ে তিন ঘণ্টা, ভাড়া ৭০ টাকা - ১৩০ টাকা। দুপুরে খাওয়া সেরে বাসে উঠেছি। কিছুক্ষণ আঁকা বাঁকা রাস্তায় চলার পর অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কয়েকবার পথে বমি করতে হল। আমরা তিন জন সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে গেলাম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে বর্দ্ধন দম্পতিকে নিয়ে আশ্রয় নিলাম। পরদিন দশমী দুর্গা বিসর্জন।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অসম রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটি। কামরূপ জেলার এই প্রাচীন শহরটি অতীতে নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। দানব রাজ নরকাসুর এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগবতে রয়েছে, নরকাসুর অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি বহু রমণী বন্দি করে রেখেছিলেন তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন। তিনি নরকা সুরকে বধ করে তাদের উদ্ধার করেন। তাদের বাসনা পূরণ করে শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করেন শ্রীকৃষ্ণের ৮ জন পাট রানি সহ ১৬০০৮ জন স্ত্রী ছিল। নরকাসুরের মৃত্যুর পর তার ছেলে রাজা ভগদত্ত নিজের বিশাল হস্তী বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় থাইল্যান্ড থেকে শান গোষ্ঠীর উপজাতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অহোমরা এসে আসাম দখল করে নেয়। তারা রাজ্যের নাম রাখেন অহোম। তার অপর নাম হল অসম। অন্যমতে অসম অঞ্চল থেকেই এসেছে অসম নামটি। ১৬২৬ খৃঃ পর্যন্ত অসম ছিল অহোমদের দখলে। সেই বৎসরই বার্মার রাজা এই রাজ্য দখল করে, তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে উপহার হিসাবে অসমকে তুলে দেন।

উত্তরে একমাত্র সমৃদ্ধ রাজ্য অসম আয়তন ৭৮৪৩৮ কি.মি. যার উত্তরে ভুটান, অরুণাচল প্রদেশ। পূর্বে নাগাল্যান্ড, মণিপুর। দক্ষিণে মিজোরাম, ত্রিপুরা। পশ্চিমে মেঘালয়, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র।

দশমীর দিন বিকালে আমরা তিন জন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে যাই বিসর্জন দেখতে। গুয়াটির এই বিসর্জন পর্বটি খুবই উপভোগ্য। প্রতিমা নিয়ে নৌকা করে ব্রহ্মপুত্রের নদীতে অনেকক্ষর্ণ সান্ধ্য আরতী। নদীর মাঝে বিভিন্ন আলোক সজ্জিত প্রতিমাগুলি এক অপরূপ পরিবেশে সৃষ্টি করে। তারপর আস্তে আস্তে বিসর্জন আরম্ভ হয়।

দশমীর দিন ভোরে আমরা গিয়েছিলাম কামাখ্যা দেবীর মন্দির দর্শনে। গুয়াহাটির প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ কামাখ্যা মন্দির। শহর থেকে ১০ কি.মি. দূরে (উ. পশ্চিমে) নীলাচল পর্বতে কামাক্ষ্যা মন্দির তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান, ৫১সতী পীঠের একপীঠ এই কামাক্ষ্যা বিষ্ণু চক্র খণ্ডিত সতীর যোনী পড়ে এই খানে। ভারতে যোনী পূজার প্রথা একমাত্র এই খানে দেখা যায়।

দৈত্য রাজ নরকাসুর কর্তৃক তৈরি মূল মন্দিরটি ১৫৫৩ খৃঃ কালা পাহাড় ধ্বংস করার পর ১৬৬৫ খৃঃ কোচ বিহারের রাজা নর নারায়ণ নতুন মন্দির তৈরি করেন। ১৮১৭ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের সংস্কার করেন কোচ বিহারের রাজারা। ডিম্বাকার মৌচাকের আদলে ৬ চূড়া শিখর শৈলী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর স্বর্ণ কলস তার উপর ত্রিশূল। মন্দির গাত্রে নানা ভাস্কর্য, হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি। মূল মন্দিরের সিড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে দেবীর অবস্থান। প্রথমে সিংহাসনে অষ্ট ধাতুর দেবী কামাখ্যার মূর্ত্তি। নীচে লাল শালু কাপড়ে ঢাকা দেবীর যোনি মূর্তি। সুন্দরভাবে বাঁধানো যোনি বেদির নিচে বয়ে যাচ্ছে জল।

কামাক্ষ্যা মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মাঝে দুপুরে ১টা থেকে ২টা মন্দির বন্ধ থাকে। এখানে পূজা দেবার জন্য তিন রকমের ব্যবস্থা আছে। অনেকটা তিরুপতির মত (ক) জেনারেল লাইন (খ) ১০১্ টাকাব ভি.আই.পি লাইন (গ) ৫০১ টাকা ভি ভি.আই পি লাইন। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর লোকদের জন্য ১০ টাকার লাইন এই টিকিট দেওয়া হয় — ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। মন্দিরে সন্ধ্যা আবতীর সময় শুধু নিত্য পূজারির ঢোকার অধিকার আছে।

আমবা তিন জন ফুল, বেল পাতা নিয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম করে অর্ঘ নিবেদন করি।

কামাক্ষ্যা মন্দিবেব আশে পাশে আবও রয়েছে সৌভাগ্য কুন্ড, দশ মহাবিদ্যা, সিদ্ধেশ্বর, কামেশ্বর, ভুবনেশ্ববী, প্রভৃতি মন্দির। এ যাত্রায় কিছুটা পূণ্য সংগ্রহ্ করে ফিরে আসি হোটেলে।

সন্ধ্যায় গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে শিবসাগর। উত্তর পূর্ব আসামের পাহাড়ি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চলছি গতি কিছুটা মন্থর। চারিদিকের পরিবেশ কিছুটা ভিন্নতর, চায়ের বাগান, পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্টেশনের কাছে কিছু বসতি। আমার বন্ধু হারাধন বর্দ্ধন তার পূর্ব পরিচিতির দৌলতে জ্ঞান দিচ্ছে এ অঞ্চলের। হারাধন বর্দ্ধন এর বয়সে আমার দিদি বাসন্তী সেনের বয়সী তখন ২৭ বছর? সে হিসাবে দাদা বৌদি সম্পর্ক। বৌদির বাড়ি যাচ্ছি শিবসাগর, দাদার শ্বশুর বাড়ি,

বৌদি আগরতলা তুলসীবতী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। বৌদিকে এক কথায় সুন্দরী বলা চলে না, যদিও গৌর বর্ণ কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

একদিন শিবসাগরে চায়ের টেবিলে বৌদি কথায় কথায় হঠাৎ আমাকে পাঞ্জা যুদ্ধে আহ্বান। আমি প্রস্তুত বিচারক দাদা হারাধন বর্দ্ধন পাশে বসে। মিনিট ৫ পাঞ্জা যুদ্ধ চলল। প্রতিবারই বৌদিকে হার স্বীকার করতে হয়। রোগা দেখে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে পাঞ্জা যুদ্ধ শুরু করে, বৌদি কি জানত আমি মধুজিত, ইন্দ্রজিত, দেব সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'বীরেন্দ্র ব্যায়ামাগারে'' (বর্তমান দৈনিক সংবাদের দক্ষিণে সৌমেন ঠাকুরের মাঠে এখন পেট্রল পাম্প) ব্যায়াম চর্চা করি। তারপর ট্রেনে কিছু বিশ্রাম ও নিদ্রা। ভোর নাগাদ শিবসাগর পৌঁছে গেলাম। ২/৩ দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে ফিরতে হবে দাদাকে নিয়ে বৌদি রয়ে যাবে বাবার বাড়ি শিব সাগরে। পরে জানতে পারলাম বুদ্ধিমান দাদা প্রথম আসন্ন প্রসবা বৌদিকে শ্বশুরালয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরবেন।

শিব আর সাগর দুয়ে মিলে শিব সাগর। ১২৯ একর ব্যাপ্ত বিশাল লেককে কেন্দ্র করে শিবসাগর। শিবের নামে উৎসর্গীকৃত শিব সাগর অহোম রাজাদের। রাজধানীতে প্রায় ৬০০ বছর অহোম রাজারা রাজত্ব করেছেন। এই সাগরের পাড়ে গড়ে উঠে শহর শিবসাগর — তার দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে তিনটি মন্দির শিবসেল, ১৭৩৪ সালে অহোম রাজ শিব সিংহের স্ত্রী সদম বিকার এটি তৈরি করেন। অসমের সবচেয়ে বড় শিব মন্দির উচ্চতা ১০৪ ফিট ভিত্তি প্রস্তাব ১৯৫ ফিট। বিষ্ণু ভোল ও দেবী ভোল (দুর্গা মন্দির)

বন্ধুর শ্বশুর বাড়িটি শহরের মাঝখানে। প্রতিবেশী আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালিহার বাড়ী। শিব সাগরে দালান কোঠার তেমন প্রাচুর্য্য নাই। সুন্দর সুন্দর বাঁশ বেতের তৈরি বাড়ি টিনের ছাউনি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি।

আমার বন্ধুর শ্বশুর মহাশয়ের যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে বিশিষ্ট বাঙ্গালী শিক্ষিক। যেটা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে সেটা হল — বাঙ্গালী আসামী এই দুই পরিবারের অনাবিল মিল - ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধন। চালিহা পরিবারের ছেলে

মেয়েদের সঙ্গে বৌদি আমাকে পরিচয় করে দেন। একটা আন্তরিকতা দেখতে পেলাম। পববর্তীকালে আসাম বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইলাম না—পাইলাম শুধু দুঃখ। স্মরণে আসে সেই রবি ঠাকুরের "এক প্রাণ একতা"। সব ব্যর্থ করে আমরা বিচ্ছিন্নতা ঝান্ডা উচিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছি আসাম ফর আসামীয়া, বিহার ফর বিহারীজ। কোথায় সেই "এক প্রাণ একতা" কোথায় সেই ভারততীর্থে মর্মবাণী। দিন দুই শিবসাগর বন্ধুর শ্বশুর বাড়িতে আনন্দে কাটাল আন্তরিক আতিথেয়তায। একদিন গিয়েছিলাম ৫ কি.মি. দূরে জয়সাগর মন্দির ও কলেজে। এই কলেজের সাথে চালিহা পরিবারের কিছু স্মৃতি বিজরিত রয়েছে। তারপর দিন বন্ধুকে নিয়ে আগরতলা উদ্দেশ্যে ধর্মনগর এসে পৌঁছি। রাত্রিবাস হোটেলে। এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রনেন চক্রবর্তী, বাড়ি দিঘির পূর্ব পাড়ে দেখা করতে যাই। তাদের আন্তরিকতায়, বিশেষ করে মায়ের (শিক্ষিকা) অনুরোধে বাত্রির খাবার সেখানে হয়। পরদিন কৈলাসহর হয়ে আকাশ পথে খোয়াই আসি ভাড়া মাত্র ১৫ টাকা।

সেখানে আমাদের ছাত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণ ছিল - যখন তারা খয়েরপুর স্কুলে গ্রীষ্ম অবকাশের স্বল্পকালীন ট্রেনিংএ ছিলেন। তাদের বাবা ছিলেন, খোয়াই এর নামকরা উকিল। আমরা সেই আ ণ বক্ষা করে পরদিন ভোবে খোয়াই থেকে সিমনা কাতলামারা সিধাই, মোহনপুর হয়ে আগরতলায় ফিরে আসি।

রূপ নারায়ণ নদীতে নৌকা বিহার

শরৎচন্দ্রের বাড়ি পানিগ্রাহী দেউটি। আমরা সস্ত্রীক, আমার মেয়ে ও জামাতা নাতি কনিষ্ক কোলাঘাটে যাব। অনিষ্কের হাতে খড়ি হবে ২৩শে জানুয়ারি সরস্বতী পূজায়। হাওড়া থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে ৫টা নাগাদ পৌঁছে যাই কোলাঘাট।

পরদিন ২৩ তারিখ সরস্বতী পূজা আরম্ভের সঙ্গে পূজার প্রস্তুতি পূজার মুখ্য বিষয় আমার নাতি অনিষ্কের বিদ্যারম্ভের মহড়া সরস্বতী দেবীর সামনে। সবাইর উপস্থিতিতে নাতি অনিষ্ক দেবী সরস্বতীর নিকট অঙ্গিকার জানিয়ে বিদ্যারম্ভের মহড়া সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করে। সবাই আনন্দিত ও উচ্ছ্বাসিত। পরদিন রবিবার ১০টায় বেড়িয়ে পড়ি। কোলাঘাট বাজারের পাশে নৌকা ঘাট। নদীতে নৌকা অপেক্ষা করছে। দুটো নৌকা এক সঙ্গে বাঁধানো। একটিতে রান্নার ব্যবস্থা অপরটিতে বসবার। চারদিকে খোলা। নাবিকরা লগি টানছে — নৌকা মাঝ নদীতে এসে উজান দিয়ে বইতে শুরু করছে। ইতিমধ্যে জোয়ার এসে গেছে। নৌকা স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলছে, প্রায় ৩/৪ কি.মি.। তারপর ভাটায় নামতে যাব। সামনে রয়েছে পরপর ৩টি ব্রীজ। একটি বোম্বে হাইওয়ের উপর, অপর দুটি রেলওয়ে ব্রীজ আপ এবং ডাউন গাড়ির জন্য। পর পরই ট্রেন যাচ্ছে। মাঝ নদীতে নৌকায় বসে ঐ দৃশ্য দেখার একটা মাদকতা আছে। একটা উন্মাদনা আছে। এ দৃশ্য ভুলবার নয়। নীল আকাশের বুক চিড়ে ব্রীজের উপর দিয়ে আপন গতিতে ট্রেন যাচ্ছে। কোনটা মাল বোঝাই ট্রেন, কোনটা যাত্রীবাহী। রূপ নারায়ণের নদীর এক প্রান্তে রয়েছে। কোলাঘাট বাজার, বি.ডি.ও অফিস, হাসপাতাল। ও পাড়ের দৃশ্যের একটা অভিনবত্ব আছে। যাহা সচরাচর দেখা যায় না। গাঁদা ফুলের বাগান, চন্দ্র মল্লিকা ফুলের বাগান, জবা ফুলের বাগান, রয়েছে হলুদ সরিষার ক্ষেত। এ সত্যি এক মনোরম দৃশ্য — যেন পৃথিবীর মাঝে স্বর্গ নেমে এসেছে। এখানে নেমে পড়ি — পাড়ে এই ফুল বাগানের মাঝে। সবাইর ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় — নৌকায় রান্না খাবার, কিছুটা জায়গায় পরিষ্কার করে খাওয়ার যথোচিত ব্যবস্থাপনায় আমরা কয়েকজন এই অবসরে সরে পড়ি পাশের গ্রামে পানিগ্রাহী। পিছনে রয়েছে দেউটি,

পানিগ্রাহী রয়েছে কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের বাড়ি প্রায় আধ বিঘার জমির উপর। বাড়িটি, চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটির পূর্ব দিকে রয়েছে গ্রামীণ রাস্তা, দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমে ঘুরে গেছে, বাড়িটিকে পূর্ব ও পশ্চিমে বেস্টন করে। মাঝ খানে ৬০x৩০ ফুট একটি মাটির দোতালা কোঠা বাড়ি রয়েছে। পূর্বদিকে সামনে ফুলের বাগান ও বিভিন্ন রকমারী গাছ রয়েছে। দেখে মনে হল বাড়িটির রীতিমত পরিচর্যা নেই। বাড়ির সামনে গেটের দুই পাশে শরৎ সাহিত্যের কিছু মর্মস্পর্শী বাণী উক্তি লেখা রয়েছে — মহেশের সেই উক্তি "আল্লা আমাকে যত খুশি শাস্তি দাও, কিন্তু মহেশ আমার তৃষ্ণা নিয়ে মরেছে। তার চরে যাবার জন্য অতটুকু জমি কেউ রাখেনি, সে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেযনি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না"।

কেন জানিনা সেখানে দাঁড়িয়ে শরৎ উপন্যাসের অনেক কথাই মনে পড়ল। একটা অদ্ভুত শিহবণ অনুভব করলাম। এমন মর্মস্পর্শী উক্তি যেন আপনা থেকে অজান্তে চোখে জল এসে গেল।

বাড়িটির দক্ষিণে কোঠা বাড়ির পিছনে একটি বাঁশঝাড় রয়েছে। দক্ষিণে ও সামনে (পূর্বে) রয়েছে কয়েকটি বাড়ি। বাড়িটি যেন শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বহন করে। ঘোষণা দিচ্ছে "আমি কিন্তু সে রকমটি রয়ে গেলাম। আধুনিকতা এখনও আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।" খবর নিয়ে জানলাম সেখানে দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে পার্ক হবে। ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অবশ্য কোন উদ্যোগ দেখতে পেলাম না। এখন স্থানীয় শরৎ নাট্য গোষ্ঠী এই বাড়িটির দেখাশুনা করে। আরো খবর মিলল এ বাড়িটি নিয়ে ভাই পো মামলা করেছে। নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরকার কিছু করতে পারছে না। বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোনে বাড়ির সীমানার বাহিরে ২টি স্মৃতি ফলক রয়েছে শরৎচন্দ্র ও স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর। পাশে আরো দুটি ফলক রয়েছে।

এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি—শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য ক্লিষ্ট দুঃখ দুর্দশাময় জীবনের কথা।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় — বেন্ডেল স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে দেবানন্দপুর গ্রামে — ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। দরিদ্র এই গ্রামটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুবিদিত। কবি ভারত চন্দ্র এখানে সাহিত্য সাধনা করেন। পিতা মতিলাল ও মাতা ভুবন মোহনীর প্রভাব কিশোর শরৎচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা তার জীবনের নিত্য সঙ্গী ছিল। অতি কষ্টে এম এ পাশ করে আর এগোতে পারেনি। ১৮৯৪ সালে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮১৬ সালে মাতা ভুবন মোহিনীর মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের বোন অনিলা দেবীর বিয়ে হয়। তারপর পিতা মতিলাল শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে মাজারপুরের দরিদ্র পল্লির খোলার চালা ঘরে চলে গেলেন। এ সময় আমপুর ক্লাবের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয় — অভিনয়, যাত্রা। একটি সাহসী ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয়।

পরবর্তীকালে এই রাজেনকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শ্রীকান্তে ইন্দ্রনাথ নামে আমরা পাই।

১৯০০ সালে শরৎচন্দ্র মানুষের মুখে শুনেন বাবা মতিলালের মৃত্যুর হয়। তখন শরৎচন্দ্র মজফরপুর গিয়ে থালা ঘটি বাটি বিক্রি করে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। ছোট দুই ভাইকে আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরা পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ছোট বোন সুন্দরীকে ছোট মামার কাছে রেখে আসেন পরে ছোট মামা ওকে বিয়ে দেন।

তারপর আত্মীয় লালমোহন গাঙ্গুলীর অধীনে ৩০ টাকা বেতনে চাকুরী নেন।

একদিন ভাল চাকুরির আশায় এক আত্মীয়ের পরামর্শে ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্রের চাকুরি হয় মনীন্দ্র মিত্রের সুপারিশে বর্মার পাবলিক একাউন্টস অফিসে। ১৯১৬ সালে কলকাতা ফেরা পর্যন্ত তিনি এই চাকুরিতে ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে রেঙ্গুনে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেন - কবি সাহিত্যিক বিশিষ্ট সমাজ সেবী হিসাবে। রেঙ্গুনে কবি নবীন চন্দ্র সেনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্টতা হয়। তিনি শরৎচন্দ্রকে "রেঙ্গুন রত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

মিস্ত্রী পাড়ায় একটি সাধারণ কাঠের দোতালার ঘরে শরৎচন্দ্র থাকতেন। এ সময় এক অসহায় যুবতি মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন। প্রতিবেশী চক্রবর্তী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শান্তি দেবীকে কিছু অর্থের বিনিময়ে এক প্রৌঢ় লোকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন। তখন শান্তি পালিয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রের ঘরে গোপনে আশ্রয় নেয়। নিরুপায় শরৎচন্দ্র শান্তি দেবীকে বিয়ে করেন। ছোট্ট সুখের সংসার - বছর ঘুরতেই এক পুত্র সন্তান। ৯০ টাকা বেতন পাচ্ছে। মোটামোটি স্বচ্ছল। নিয়তির থাবা পড়ল এই ছোট্ট সুখের সংসারে। ১৯০৮ সালে রেঙ্গুনের ভয়াবহ প্লেগ শরৎচন্দ্রের সংসার তছনছ করে দিয়ে গেল। শরৎচন্দ্রর স্ত্রী শান্তি দেবী ও শিশু পুত্রকে হারালেন। তারপর আবার নিঃসঙ্গ জীবন মিস্ত্রীপাড়ার সেই বাড়িতে।

১৯১০ কৃষ্ণদাস অধিকারী তার একমাত্র বালবিধবা যুবতি মেয়েকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে আসে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অসহায় পিতার করুন আকুতি মিনতি শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করতে পারলেন না। মোক্ষদাকে বিয়ে করলেন — নতুন নাম দিলেন হিরন্ময়ী। এই হিরন্ময়ীই শরৎচন্দ্রের একমাত্র সাথী। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় চলে আসেন। পত্নী হিরন্ময়ী দেবীকে নিয়ে হাওড়ার শিবপুরে ভাড়া বাড়িতে ওঠে আসেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্যিকদের সাহচর্য্যে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন কাব্য ও উপন্যাস লেখায়। ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্র কলকাতা ছেড়ে হাওড়া জেলার পানিগ্রাহী অঞ্চলে এই বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে। দেওটি স্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে পানিগ্রাহী অঞ্চলে এক অপূর্ব গ্রাম্য পরিবেশে এই বাড়ি। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ২২ বছর পর ১৯৬০ সালে স্ত্রী হিরন্ময়ী এখানে দেহত্যাগ করেন। তাদের কোন সন্তান ছিল না বাড়ির দক্ষিণ দিকে পাশে তাদের স্মৃতি ফলকের সামনে ভাবছি এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র এত বড় সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

হঠাৎ সহযাত্রীদের ডাকে স্বম্ভিত ফিরে এলো। তারপর নদীর পাড়ে সবাই এক সঙ্গে ভোজনপর্ব শেষ করে নৌকায় উঠি। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ফিরে আসি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সুন্দর নৌকা বিহারের স্মৃতি নিয়ে।

সিকিম সফর

২০শে মে, ২০০৮

আমি একটু ভ্রমণ পিপাসু। সেদিন হঠাৎ মেয়ে আমাকে ফোন করে জানাল — বাবা চল এবার গ্যাংটক যাই। এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি স্বভাবতই খুশি— বিশেষ করে জামাতা অনিত দাসের ব্যবস্থাপনায় ভ্রমণ। কোন ঝুট ঝামেলা আমার নেই—রেল টিকিট রিজার্ভেসন, হোটেলের ব্যবস্থা কোন কিছুই আমাকে ভাবতে হচ্ছে না। তা ছাড়া নিরাপত্তা আমাদের এ বয়সের বিশেষ প্রয়োজন। ৭৭ বৎসর বয়স তাই উৎসাহ, উদ্যম থাকলেও চলা ফেরার সামর্থ আছে মনে করা অন্যায়।

আমাদের টিকিট ছিল সামার স্পেশাল কলিকাতা থেকে শিলিগুড়ি — রাত্রি ১১.৫৫ মিঃ। ঝড় বৃষ্টির সম্ভারনা — আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণায় আমরা একটু বিচলিত তাই রাত ৮টায় রওনা হই। হাওড়ায় ৯টা নাগাদ পৌঁছে যাই খাওয়া দাওয়া সেখানেই সেরে নিই, ১১.৫৫ গাড়ি ছাড়ে।

সেকেন্ড ক্লাস এসি স্লিপার। এবার রেল কর্তৃপক্ষের সেবা যত্নে একটু নতুনত্ব দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের সবাইকে একটা করে প্যাকেট দিয়ে গেল তাতে রয়েছে ভারতের তাঁত বস্ত্রের ২টি চাদর, ১টি পিলো ছোট টারকিস টাওয়েল। কম্বল ও বালিশ।

আমরা যথাসময়ে পরদিন ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ি পৌঁছে যাই। হিলকার্ট রোডে তারকনাথ হোটেলে ২টি কক্ষ বুক করা ছিল। পথে মোবাইলে সময় জানিয়ে দেওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হয়নি। হোটেল বয় এসে আমাদের মালপত্র সযত্নে নির্দিষ্ট রুম দুটিতে একটি দোতলায় অপরটি চার তলায় রেখে

Chungthang
Mangan
Rumtek
Gangtok
Darjeeling
Kalimpong
Teesta
Kurseong
Siliguri
Bungkulung
NJP Rly Station

আসে। জামাতা অফিসে আনুসঙ্গিক কাজকর্ম সেরে নেয়। এতটা নিরাপত্তা, এতটা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ আমার জীবনে এই প্রথম। কাজেই কিছুটা স্বস্তি বোধ হয়েছে। মেয়ে জামাতা সর্বক্ষণ খবরা খবর নিচ্ছে — কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? দেহ মনের খবরা খবর নিতেও কোন ত্রুটি নেই। বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যায় ছাতি নিয়ে বাজারে গেলাম পান ও চ্যবণপ্রাশ সংগ্রহ করতে।

পরদিন ২২শে মে সকালে প্রাতকৃত্য সেরে বেড়িয়ে পড়ি। বাসস্ট্যান্ডে এসে ১১০০ টাকায় সুমো নিয়ে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সুন্দর মসৃণ পথ, দুই ধারে পাহাড়, সবুজের আর মেঘের খেলা। সিকিমের প্রবেশের আগে পাহাড়ের উপর হাত উঠিয়ে ড্রাইভার জানান দিল — ঐ যে ছবির মত বিশাল বাড়িটি দেখছেন সেটি বিখ্যাত চিত্র তারকা ডেনীর বাড়ি। সিকিম প্রবেশের মুখে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে রয়েছে মনিপাল বিশ্ববিদ্যালয় ও মনিপাল হাসপাতাল — তারপর পথের পাশে আমাদের ফুটবলের গর্ব বাইচুং ভুটিয়ার বাংলো বাড়ি। দুপুর ১২টা নাগাদ পৌঁছে যাই। এখানে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া-এ আমাদের হোটেল বুক করা ছিল — মধুবল হলিডে হোম। এখানে দোতালা ও চারতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। পরে অবশ্য আমাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আমাদের একতলায় এবং মেয়ে জামাতা ও নাতি তিন তলায় ব্যবস্থা করে দেয়।

এখানে রিক্সা ও অটোর কোন চল নেই। শুধু মারুতি ও সুমো গাড়িই গ্যাংটকের যাতায়াত ব্যবস্থার একমাত্র বাহন। সরকার অবশ্য বিভিন্ন জায়গার ভাড়া বেধে দিয়েছে—তবু দরাদরি চলে। আমরা সন্ধ্যায় বেড়িয়ে পড়ি — মহাত্মা গান্ধি রোডে গ্যাংটকের প্রধান বাজার। ৪০ টাকা দিয়ে সেখানে পৌঁছে যাই আমরা সবাই। এখানে বাজার দেখে স্তম্ভিত। এত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বাজার আমি কোথাও দেখিনি—এবং এ অঞ্চলে কোন যান বাহন চলা নিষিদ্ধ— ৬০০ মি. x ২০০ মি. খোলা জায়গা দুই পাশে প্রশস্ত রাস্তা মাঝে রয়েছে ফুলের বাগান প্রশস্থ ৫ মিটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। তার সংলগ্ন দুই পাশে রয়েছে বসবার ব্যবস্থা। দুইটি রাস্তার দুই পাশে রয়েছে সুসজ্জিত দোকান, ছবির মত। অবসর বিনোদনের পক্ষে সুন্দর পরিবেশ। সব রকম সামগ্রীর সমাহার রয়েছে — সেই সব দোকানে ক্রেতাদের

জন্য। শেষ প্রান্তে রয়েছে - শাক সব্জি ও মাছ মাংস ইত্যাদির বাজার। এখানে হকার্সের কোন অস্তিত্ব নেই ফুটপাথে।

এখানে রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুস্থ পরিবেশের দিকে জনসাধারণের সচেতনতা আমায় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। ভারতের কোথাও এ দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি। সেদিন আগরতলায় মাণিক্য ক্লাবে ভ্রমণ কাহিনির উপর আলোচনায় আমার এই মন্তব্য শুনে, পাশে বসা মিহির দেব মহাশয় (চেয়ারম্যান ত্রিপুরা পলিউসন কন্ট্রোল বোর্ড) জানালেন পলিউসন কন্ট্রোলে সিকিমের স্থান ভারতে দ্বিতীয়। শুনে আমার বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা বেড়ে গেল। সিকিম সবকার ও যথেষ্ট সক্রিয়। গাড়ি থেকে নেমে সিকিমে পায়ে হেঁটে ঢুকতে হয় লাইন ধরে। পাশ থেকে দুইজন লোক যাত্রীদের পায়ে জীবাণু নাশক গরম হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে —যাতে সিকিমে কোন জীবাণু ঢুকতে না পারে। মাঝে মাঝে নোটিস বোর্ড রয়েছে শহর পরিষ্কার রাখুন। যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করানো চলবে না রাস্তার একপাশে সংরক্ষিত ফুটপাথ ছয় ফুট - দু'পাশে রয়েছে লোহার পাইপের বেলিং নিরাপত্তার জন্য কাজেই দুর্ঘটনা নেই বললেই চলে। এখানে মাছ, মাংস, শাক সব্জির জন্য স্টল আছে। এখানে আমরা ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে ফিরে আসি হোটেলে।

পরদিন ২৩শে মে গ্যাংটক পরিক্রমায় বেড়িয়ে পড়ি কিছুদূর গিয়ে আমরা পাই গ্যাংটক হ্যান্ডলুক হাউস দেখে শুনে কিছু খরিদ করলাম গ্যাংটকের স্মৃতি। এরপর জলপ্রপাত দেখে আমরা গুঞ্জ মনাস্ট্রিতে এসে পৌঁছি, সুন্দর শান্ত পরিবেশ লোকজন দুই একজন ইতস্ততঃ ঘুরছে। আমি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানি, মনাস্ট্রিতে প্রবেশ কোন বাধা নেই। মনাস্ট্রির দরজায় বিশাল পর্দা স্বাভাবিকভাবে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। বুদ্ধের প্রতিকৃতি রয়েছে তাঁরই একান্ত শিষ্য - গুরু পদ্ম সাম্ভলা। দরজার পাশে রয়েছে বড় ঢোলাকৃতি চক্র আমরা সবাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করলাম।

টসি ভিউ পয়েন্ট গ্যাংটকের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয় চারিদিকের পাহাড়ে ঘেরা শ্যামল বনানী তার মাঝে মাঝে বরফ আবৃত শৃঙ্গ গুলি শোভা পাচ্ছে।

সিকিমে গীর্জা সামনে সস্ত্রীক লেখক, মেয়ে সুস্মিতা ও নাতি অনিষ্ক

সস্ত্রীক লেখক সঙ্গে নাতি অনিষ্ক এবং জামাতা - সিকিম

লেখক ও জামাতা অনিত দাশ, নাতি অনিষ্ক হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে (সিকিম)

Baba Harbhajan Mandir - Nathula

সেখান থেকে আমরা যাই গণেশ টক, হনুমান টক ও সাইবাবার মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে উপরে না উঠলে সুন্দর এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মন্দিরের শোভা উপভোগ করা যাবে না, সেখান থেকে হোটেলে মধুবন হলিডেতে ফিরে আসি।

২৪শে মে আজকের ভ্রমণ সূচির প্রধান আকর্ষণ নাথুলা পাশ ভারত ও চিন সিমান্ত। গ্যাংটক শহর থেকে ৫৬ কিমি উত্তর পশ্চিমে সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ১৪,৪৫০ ফুট। পথে গ্যাংটক থেকে ৩৭ কি.মি. দূরত্বে আমরা পাই Tsomgo Lake ভুটিয়া ভাষায় মানে "Source of Lake" সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ১২,৪০০ ফিট। এত উঁচুতে ১ কিমি দৈর্ঘ্য ডিম্বাকৃতি এই হ্রদ, চারিদিকে শ্যামল বনানী ঘেরা পাহাড়ের মাঝে অপূর্ব মনোরম দৃশ্য আমাদের অভিভূত করেছে। এই হ্রদের গভীরতা ১৫ মি. স্থানীয় লোকেরা এই হ্রদকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে। শীতকালে এই হ্রদ বরফে ছেয়ে যায় ২/৩ ফুট পুরো হয়ে। হ্রদের এই রূপালী চাদরের আস্তরণ এই হ্রদের সৌন্দর্য্য এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। মে থেকে আগস্ট এই হ্রদের চারিদিকে বিভিন্ন ফুলের সমারোহ এক অনির্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে (Inclusive the rhododendrans, various species of premular, Blue and Yellow pappies etc.)

এখানে রেড পান্ডার আদর্শ বাসস্থান। এই জলাশয়ে বিভিন্ন পাখির সমাবেশ। এত উঁচুতে এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এই বিশাল হ্রদ দেশি ও বিদেশি পরিব্রাজকদের প্রধান আকর্ষণ।

সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে আমরা পৌঁছলাম বাবা হরভজন সিং স্মৃতি মন্দির। এই মন্দিরটির অবস্থান নাথুলা এবং জালপা প্যাসেস এর মাঝে। এই স্মৃতি মন্দিরের একটি করুন ইতিহাস আছে।

হর৬জন সিং ২৩ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন সিপাহী। যখন সীমান্ত রক্ষায় কাজ করছিলেন, তখন হঠাৎ পাহাড়ি ঝর্ণার প্রবল স্রোতে ভেসে যান। অনেক অনুসন্ধানের পরও তার মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। পরে তার এক সহকর্মী

স্বপ্নে নির্দেশ পায় — "আমাকে ঝর্ণার নীচে বরফের তলায় পাবে।" নির্দিষ্ট স্থান থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার সহকর্মীকে মৃত হরভজন সিং স্বপ্নে নির্দেশ দেয় — "তাঁর একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করার জন্য"। সেই স্মৃতি মন্দির এখন একটি ধর্মীয় মর্যাদা নিয়ে শত শত যাত্রীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে সেখানে অবস্থান করছে। পাশে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একটি সংগ্রহশালা রয়েছে — বিভিন্ন চাইনিজ সামগ্রী রয়েছে। আমরাও কিছু খরিদ করলাম নাথুলা পাসের স্মৃতিস্বরূপ। সেখানে বাহিনীর লোক কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে যাত্রীদের কাছ থেকে ৫০ টাকা ডোনেশন নিয়ে একটি চমৎকার সুন্দর সার্টিফিকেট অফ ভিজিট উপহার দিচ্ছে। আমার জামাতা অনিত ও আমার নাতি অনিষ্ক দুটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে। এই অঞ্চল ভ্রমণের প্রমাণপত্র।

গ্যাংটক থেকে ৫৬ কিমি. উত্তরে নাথুলা পাশ। উচ্চতা ১৪৪৫০ ফিট ভারত চিনের সীমান্ত একটি উচ্চতম সীমান্ত পথ ভারত ও চিন সংযোগকারী গাড়ির যাতায়াত রয়েছে, চলছে সিকিম ও চিনের সঙ্গে বাণিজ্য। চারিদিকে সবুজ বনানী বিভিন্ন এলপাইন গাছ ও বিচিত্র সব ফুল পাহাড়ের বুকে শোভা পাচ্ছে। শান্ত পরিবেশ কোন বসতি নেই শুধু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অতন্দ্র প্রহরী ভারতের সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত। প্রচন্ড ঠাণ্ডা জমে যাওয়ার উপক্রম। সেখান থেকে ৬ কিমি. দূরে নাথুলা পাশ। যাওয়ার অনুমতি নিতে হয় পর্যটন অফিস থেকে। তাছাড়া রয়েছে মেডিকেল চেকআপ, অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি। অনুমতি পাওয়ার পর অনেকে যাওয়ার ছাড়পত্র পায় না — বিশেষ করে বয়স্করা। প্রচন্ড শীতের তাড়া খেয়ে আমরা তাড়াতাড়ি নেমে আসি। দুপুর ২টা নাগাদ মধুবন হোলিডে হোটেলে ফিরে আসি।

পরদিন ২৫শে মে ভোরে রওনা হই — পেলিং এর উদ্দেশ্যে, ছোট শহর পশ্চিম সিকিমে। পথে দুপাশের অপূর্ব দৃশ্য পাহাড়, বরফাবৃত শৃঙ্গ সবুজ বনরাজি, পাহাড়ের গায়ে, রূপালী জলের ধারা। পাহাড়ের গায়ে ঝাউ গাছগুলি মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে যাচ্ছে — আর কখন ঝাউগাছ গুলির চূড়া উঁকি দিয়ে জানান দিচ্ছে আমরা মুছে যাইনি। মেঘের এ খেলা অসহ্য। ডেকে মেঘকে বলছে তোমার সাহস

ও কম নয়। আমাদের পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চাইছ। যখন সূর্য মামা রোদ দিয়ে তাড়া করে তখন পালিয়ে পাওয়ার পথ পাওনা। তাই বলছি দুঃসাহস করো না। তাছাড়া কোনো সূর্য্য রশ্মি না পেলে আমাদের খাবার জোটেনা। রোদ আমাদের প্রাণ ধারণের আহার যোগায় — কার্বোহাইড্রেডের সংস্থান করে আমাদের পত্র রাজিতে অবশ্য আমরা এই যে বিশাল সবুজ, সজীব বনরাজি নিয়ে বিরাজ করছি — তার জন্য আমরা তোমার কাছে, ঋণী। মেঘ থেকে বৃষ্টি পেয়ে আমরা সজীব হয়ে উঠি, ফলে ফুলে শোভা পাচ্ছি। পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করছি। আবার তুমি অবশ্য ঋণী, সূর্য্য মামার কাছে, সমুদ্র থেকে বাষ্পাকারে জল বয়ে এনে মেঘকে পুষ্ট করছ। তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে পুষ্প করছ। সজীব করছ। কেন আমাদের ঝগড়া হবে, মিলে মিশে পৃথিবীর সেবা ধর্ম পালন করব। পৃথিবীর লোক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে। শিক্ষা নিবে সেবা ধর্মের সব আমাদের দেখে।

চারিদিকের পাহাড় ঝর্ণা শ্যামল বনরাজির শোভা দেখতে দেখতে আমরা এসে গেলাম পেলিং। তখন বেলা ১১টা। হোটেল কাঞ্চনজঙঘা পৌঁছে সেদিনের মত বিশ্রাম নিলাম। সেদিন আমাদের অন্য কোন ভ্রমণ সূচি ছিল না।

ছোট্ট শহর পেলিং সমুদ্রতল থেকে ৬১০০ ফিট উঁচু। পেলিং ভ্রমণকারীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হযে উঠেছে, পেলিং এর নিউ হেলিপেড থেকে কাঞ্চনজঙঘাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ। দার্জিলিং এর টাইগার হিল থেকে যারা কাঞ্চনজঙঘাকে দেখছে তারাও এখান থেকে কাঞ্চনজঙঘাকে দেখার লোভ সম্ভরন করতে পারেন নি।

২৬শে মে ভোরে ওঠে ৫টা নাগাদ বেড়িয়ে পড়ি পায়ে হাঁটা ৫ মি. এর রাস্তা। ওয়েস্ট পেলিং নিউ হেলিপড-এ পৌঁছে গেলাম। উঁচু বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। সেখানে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে অনেকে সেখানে পৌঁছে গেছে। আমার জামাতা ও রয়েছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে আর সূর্য্যদেবের দৃশ্য দেখে, সূর্য্য আস্তে আস্তে পাহাড়ের পিছন থেকে উঠছে — আর ছুঁড়ে দিচ্ছে সোনালী আভা কাঞ্চনজঙঘার শৃঙ্গে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ভাষায় তার প্রকাশ নেই। দেখতে হবে. অবলোকন করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য।

সূর্য্যের সোনালী আভায়, কাঞ্চনজঙঘার কাঞ্চন সোনালী রূপ আকর্ষণীয়। যেন মনে হচ্ছে কাঞ্চনজঙঘা রানি সেজে হিমালয়ের বুকে শোভা পাচ্ছে। উপরে রয়েছে টুই শৃঙ্গ, নেপাল শৃঙ্গ, পিরামিড শৃঙ্গ, জনসঙ্গ শৃঙ্গ, সেন্টিনেল শৃঙ্গ, আর নীচে রয়েছে মাউন্ট টেল; মাউন্ট কাথাং মাউন্ট ককথাং। এই সব শৃঙ্গ রাজি যেন রানি কাঞ্চনজঙঘার সাথী হয়ে শোভা পাচ্ছে — ঐশ্বর্য্য মন্ডিত রানী কাঞ্চনজঙঘার রূপে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

সূর্য্য ইতিমধ্যে কিছুটা উপরে উঠে গেছে — চেয়ে দেখি সোনালী আভা আর নেই কাঞ্চনজঙঘার শৃঙ্গে — সেখানে রূপালী আভা স্থান নিয়েছে। এই রূপালী আভা রানিকে দিয়েছে নতুন রূপ, যদিও তুলনীয় নয় সেই স্বর্ণ মন্ডিত কাঞ্চনজঙঘার সঙ্গে।

আস্তে আস্তে কাঞ্চনজঙঘা তার বরফ মন্ডিত শৃঙ্গ নিয়ে স্বকীয় রূপ নিয়ে শোভা পাচ্ছে। ফিরে এসে সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা সেদিনের যাত্রা শুরু করি। টারকু রানিলুক হয়ে ১০টা নাগাদ সেবারো রক গার্ডেন পৌঁছি রাস্তা থেকে ৫০-৬০ ফুট নীচে। এরপর আমরা কাঞ্চনজঙঘা জলপ্রপাত দেখি — সেখানে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি।

পাহাড়ের সবুজ বনানীর মাঝে কাঞ্চনজঙঘার শুভ্র জল ধারা এক অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পথে আসতে দেখি পাহাড়ের উপত্যকায় এঁকে এঁকে এক বিশাল জলপথ (লেক) চারিদিক রয়েছে পাহাড় আর পাহাড়, শ্যামল বনরাজি রয়েছে পাহাড়ের গায়ে রূপালী ঝর্ণা ধারা অপূর্ব অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশ। দুপুর ২টা নাগাদ ফিরে আসি কাঞ্চনজঙঘা হোটেলে।

অপরাহ্নে ভ্রমণ সূচির মধ্যে ছিল সিকিমের পুরানো রাজবাড়ি তাসিডিং মনাস্ট্রি। আমরা ২ জন এই ভ্রমণ সূচীতে অংশ গ্রহণ করিনি। পরিশ্রান্ত, তাই বিশ্রাম নিলাম। মেয়ে সুস্মিতা জামাতা ও নাতিকে নিয়ে বেড়িয়ে গেল। পরে অবশ্য মেয়ের কাছ থেকে রাজবাড়ির বর্ণনা ও মনাস্ট্রীর খবরা খবর নিলাম।

রাজবাড়ি বলতে শুধু ধ্বংসাবশেষ রাস্তাঘাট নেই অরণ্যের মধ্যে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে সেই সিকিম রাজা মহারাজাদের ঐতিহ্যের স্মৃতি। আর ঘোষণা দিচ্ছে আমরা এখানে, বিলীন হইনি।

টাসিটং মনাস্ট্রি — পেছনে রয়েছে কাঞ্চনজঙঘা শৃঙ্গ তারই সামনে হৃদয়াকৃতি (Heart like) পাহাড়ের উপর এই মনাস্ট্রী। বুদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে — গুরু পদ্ম সম্ভাগ অষ্টম শতাব্দীতে সিকিম রাজ্যের এই স্থানে বাকস করতেন, পরে 18th Centuryতে Ngadak sempa, Chumpo তিন জন লামা এই মনাস্ট্রী তৈরি করেন মহাসমারোহে প্রথা টোগিয়াল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

টাসি টং মনাস্ট্রী খুব বিখ্যাত পবিত্র মনাস্ট্রি। Thong Water Rangdol নামে এই মনাস্ট্রি বিশেষ পরিচিত — যার অর্থ Saviour by mere sight. সাধারণের বিশ্বাস শুধু দর্শন ও করজোরে প্রণামে সমস্ত পাপ ধূয়ে যায় ভক্তদের। প্রতি বছর ১৪ এবং ১৫ প্রথম লুনার মাসে Bhum Chu Ceremony এখানে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। পবিত্র জল সংগৃহীত ও রক্ষিত হয় — লামাদের মঙ্গলের জন্য। এই উৎসবের দিনে, এই পুণ্য জল লামাবা সংগ্রহ করে।

পরদিন ২৭শে মে ভোরে স্নান প্রাতঃরাশ সেরে আমরা বেড়িয়ে পড়ি সিংশোর ব্রীজ দেখার জন্য। পশ্চিম সিকিমের উত্তরে সেই ব্রীজ। এটা সিকিমের সবচেয়ে উচ্চতম ব্রীজ, ডেটাম শহরের কাছে। সিংগ্রেলা পর্বত শ্রেণি ও অন্যান্য উঁচু নীচু পাহাড়ের সমাহার চারিদিকে একটা শান্ত সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আমরা ব্রীজের উপব দিয়ে ওপারে যাই। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ রয়েছে এই ব্রীজে — হেলে দোলে আমরা হেঁটে গেলাম ওপারে। ব্রীজের দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটার, ২ পাহাড়ের মাঝে ঝুলন্ত। ব্রীজের দুই প্রান্ত দুটি পাহাড়ের গায়ে বাধা রয়েছে। এর কলা কৌশলের কৃতিত্ব এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের যার সাফল্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরে ফলকে, উৎকৃর্ণ বিবরণ নিয়ে। সেখান থেকে আমরা ফিরে আসি দুপুর ১টায়

কাঞ্চনজঙঘা হোটেলে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

সন্ধ্যার পর পৌঁছে যাই শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে তারপর যথারীতি টিকিট কেটে সারা রাত্রির জন্য বাসে উঠে পড়ি কলিকাতার উদ্দেশ্যে, ভোর ৭ নাগাদ কলিকাতায়।

২৩বি কানাই ধর লেন মেস বাড়ি

২৩বি কানাই ধর লেন এর মেস বাড়ি আগরতলার অনেকের কাছে বিশেষ পরিচিত। আমরা যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগের সন্ধানে কলকাতায় আসি তখন এই মেস বাড়ির সান্নিধ্যে এসে পড়ি বন্ধু বান্ধবের সহযোগে।

কলেজ স্ট্রীট থেকে মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে পূর্বে অগ্রসর হলে আমহার্স্টস্ট্রীটের আগে দক্ষিণ দিকে এই লেন। সামনে রয়েছে তেলে ভাজার দোকান, পুটি রামের মিষ্টির দোকান, ফেভারিট কেবিন।

কলকাতা শহরের মাঝখানে - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছে - তাছাড়া রয়েছে মধ্য কলকাতার বিভিন্ন কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ ইত্যাদি এ কাবণে পড়াশুনার জন্য বাড়তি সুবিধা। আগরতলার অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল, শিক্ষক, প্রফেসর এখানে থেকে পড়াশুনা করেছেন।

বাডিটিতে ৩টি রুমে মেসের মেম্বার, থাকতেন দোতলায় ২টি রুম এবং তিন তলায় একটি রুম। একতলায় রান্না ও স্নানের ব্যবস্থা। বাড়ির প্রবেশ দ্বারে বাঁয়ে একটি ছোট রুম ছিল। সেখানে থাকতেন প্রকাশবাবু, অবিবাহিত জীবন। সারাদিন বিভিন্ন প্রকাশকদের আড্ডা ও সেই সঙ্গে ব্যবসা। সবাইর সঙ্গে মিলে মিশে আছেন। কোথাও ঝগড়াঝাটিতে নেই, শান্ত ও সবার প্রিয়। দোতলায় একটি ও তিন তলায় একটি পরিবার ছিল - যথাক্রমে ব্যবসাযী ও চাকুরিজীবী। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে কাপড়ের দোকান। একটি ছেলে সমীর ও একটি মেয়ে সন্তান ছিল। ভদ্রলোক দুই বেলায় দোকানে যেতেন আর ভদ্রমহিলা মানে মীরাদি ২টি ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করতেন। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা (মীরা দিদি) দুই জনেই স্থূলকায়। ভদ্রমহিলা অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ালটেয়বে ছিলেন। তাই বাংলা জানতেন না ভাল ভদ্রমহিলা। আমাদের সঙ্গে মেলা মেশা করতেন। কারো কারো সঙ্গে যথেষ্ট

ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গেছে বাংলা ভাষা শিখতেন। পরে অবশ্য জানাজানি হওয়ায় দুই তরফের সাবধানতায় বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

উপরের ঘরে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ পরিবার দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে। বড় ছেলে ব্যাঙ্কে চাকুরি করতেন, ছেলেটি পড়াশুনা করতেন। মেয়ে অবিবাহিত। কারো সঙ্গে মেলামেশা ছিলনা।

আমাদের রান্নার দায়িত্ব ছিলেন বন, ওড়িশার অধিবাসী। নম্র, কখনো অবাধ্য হতে দেখিনি। সকালে বিকালে যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেসের সদস্যদের জল খাবারের ব্যবস্থা করে যেতেন। বনর একদাদা বনের অনুপস্থিতিতে আমাদের মেসের কাজকর্ম, সমানভাবেই মোটামুটি ব্যবস্থা করে দিত।

বাজারের ব্যাপারটা। বনই দেখাশুনা করত। অবশ্য একজন মেম্বারের তত্ত্বাবধানে—অস্থায়ীভাবে মাসে মাসে বদলি হচ্ছে।

নিজেদেব তত্ত্বাবধানে পরিচালনায় যেমন খরচ কম পড়ে — তেমনি রান্নায় বৈচিত্র্য থাকত। রবিবার দিন মাংস তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রুচির রান্নার ব্যবস্থা। শিয়ালদহে বাজার - তাই যখন যেমন খুশি তেমন ব্যবস্থা। কোন দিন হয়ত পাবদা মাছ, আবার কোন দিন গলদা চিংড়ি। চমৎকার ব্যবস্থা এই মেসে।

এবার মেম্বারদের প্রসঙ্গে আসা যাক। কয়েকজন চাকুরিজীবী। আর বাকীরা লেখা পড়ায় ব্যস্ত। অনেকে লেখাপড়ার সঙ্গে চাকুরি ও করছে। আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫৪ অসিত বিশ্বাসের সূত্রে। অসিত বাবু ব্যাঙ্কে চাকুরি করতেন সঙ্গে এম.কম নিয়ে পড়াশুনা।

যাদের আগরতলার সূত্রে পেয়েছি তারা হলেন নির্মল বণিক, সুশীল চক্রবর্তী, মন্টু সাহা। আমি আগরতলায় ফিরে আসি সাংসারিক কিছু ঝামেলা ও স্কুলের চাকুরির প্রয়োজনে। আমাদের বসত ভিটের মামলা জনেশ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ৩/৪ বছর মামলা চলার পর আমার উকিল জ্ঞানদা বাবুর পরামর্শে মীমাংসা হয় — মাসিক ২৫ কিস্তিতে দেয়। এ ব্যবস্থা চলতে থাকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। তারপর

রেজিস্ট্রেশন হয়। আমি ১৯৫৯ সালে উমাকান্ত স্কুলে, প্রধান শিক্ষক শীতি কণ্ঠ সেন। আমি ছুটি নিয়ে কলিকাতায় পাড়ি দেই পড়াশুনার উদ্দেশ্যে এম.কম ও কস্টিং পড়ার জন্য।

তারপর অসিত বাবুর সহযোগিতায় মেসে স্থান পাই। নির্মল বাবুর পাশের সিটে থাকতাম। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তারপর এক নাগাড়ে ৬-৭ বছর এই মেসেই কাটাই। এখানেই আমার জীবনের ভিত হয়। আমি এম.কম ও কস্টিং পাশ করি। এই মেসের স্মৃতি আমি কখনই ভুলতে পারব না।

নির্মল বণিক আগরতলার স্টেনোগ্রাফারের চাকুরি করতেন। আগরতলার যারা পি.এস. তারা অনেকেই নির্মল বাবুকে চেনে। আমি আগরতলায় গেলে প্রাক্তন সহকর্মীরা নির্মল বাবুর খবরাখবর নিতেন। নির্মল বাবু আগরতলা ছেড়ে কলকাতায় এসে কলকাতা হাইকোর্টে জজএর পি.এ হিসাবে যোগদান করেন। তারপর প্রমোশন পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হন। আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ রয়েছে। একদিন খবর পেলাম তিনি বিয়ে করে কালিঘাটের কাছে কোথাও বাড়িভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক থাকেন। আমি অবশ্য সে বাড়িতেও গিয়েছি। তখন আমি আগরতলায় চাকুরিতে। তারপর নির্মল বাবু বাড়ি করেন কোন্ননগরে। তখন আমাদের অবসর জীবন। আমি শ্যামা বাবুকে নিয়ে কোন্ননগর সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর অবশ্য সে বাড়ি বিক্রি করে। ফ্ল্যাট কিনে চলে যান বোধন কোপাবেটিভ, পাটুলী। তিনি মাঝে মাঝে ফোন করে খবরা খবর নিতেন এবং ফ্ল্যাট এ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি সস্ত্রীক মেয়ে নিয়ে পাটুলীর ফ্ল্যাটে যাই। উভয়কেই যথেষ্ট অসুস্থ দেখলাম। ছেলে 'টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ায়' আছে — ছাপা খানার অফিসার অবিবাহিত। এবার গিয়ে জানতে পারলাম ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ে নির্দিষ্ট হয়ে আছে — এখন শুধু উৎসব। বণিক বাবুর, এক বন্ধু মধুসূদন চক্রবর্তী পাশে একটা মেসে থাকতেন। সেন্ট্রাল আই.বি তে কাজ করতেন, খেলার পাগল — ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক। কি অদম্য উৎসাহ খেলা দেখার, বৃষ্টি বাদল — সব সময় মাঠে ভিজে জামা কাপড়ে। চটি হারিয়ে ফিরতেন। নির্মলবাবু ও খেলার পাগল। খেলার পর মেসে এই দুই জনের মিলন — আমরা খুব উপভোগ করতাম।

মধুসূদন চক্রবর্তী — আগরতলা ডি.এস.পি চক্রবর্তীর ছোট ভাই এর পর বিয়ে করে আগরতলায় চলে যান। স্ত্রী রানীরবাজার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, অমায়িক— আমরা মাঝে মধ্যে যেতাম মঠ চৌমুহনী বাজারের বাড়িতে, দোতালা বাড়ি, ২টি মেয়ে এবং X-এ পড়ে ও স্বামী স্ত্রী। সুখি পরিবার। একদিন পত্রিকায় দেখি খেলা রানী, রানীবাজার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান এবং মৃত। এমন দুঃসংবাদ আর হয়না। আমরা গিয়েছিলাম—বড় মেয়ে ফার্মাসিস্ট নিয়ে পড়াশুনা করছিল — ফিরে এসেছে। কি করুন অবস্থা মধুসূদন বাবুর, এই দুই মেয়েকে নিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা ছিল না। কলকাতায় চলে আসার পর যোগাযোগ কমে যায়। একদিন হঠাৎ মধুসূদন বাবু বড় মেয়েকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির। বড়মেয়ের বিয়ে হয়েছে, অনুপমা এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাট-এ আসে— বাবাকে নিয়ে আসে আমার ফ্ল্যাটে। অনেকদিন পর দেখা, ভাল লাগল খবর নিয়ে জানলাম- ছোট মেয়ে এখানে দমদম প্রাইভেট রোডে এক ফ্ল্যাটে থাকে। জানতে পারলাম মধুবাবু ফ্ল্যাটটি কিনেছে। আমি অবশ্য একদিন গিয়েছিলাম দেখা হয়নি। মধুসূদন বাবুর ঠিকানা ফোন নং দিয়েছি নির্মল বণিককে। পুরাতন বন্ধুটি সঞ্জীবিত হবে এই আশায়।

অসিত বিশ্বাস গ্লিংডার হাউস এ স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। সেই সুবাদে আমি সেখানে একাউন্ট খুলি। এটি আমার কলকাতার প্রথম একাউন্ট। আমার পড়াশুনার ব্যাপারে অসিত-বিশ্বাস ছিল আমার একান্ত আপনার। যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি - পাশে অসিতবাবুকে পেতাম।

আমি যখন আগরতলায় ফিরে যাই তখন অসিত বাবু সস্ত্রীক সঙ্গে ছ'বছরের ছেলে নিয়ে আগরতলায় আসে। সে সুবাদে আমার আতিথ্য। খুব ভাল লাগল অনেক দিন পর অসিত বাবুকে কাছে পেয়ে। তারপর অবশ্য আমি ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলাম। P9, LN Motilal Road, SBI Housing No.4 সস্ত্রীক। বহুদিন পর দেখা। স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলে বিবাহিত, ব্যবসা করেন। অসিত বাবু অসুস্থ কথা বলতে পারেন না। তবু তার আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশে কোন কার্পণ্য নেই। অসিতবাবুর এক বন্ধু চিত্তরঞ্জন পাল, আমোদে খুব আপনার লোক। আগরতলায়

বাড়ি। চাকুরি নিয়ে M.Com পড়েছেন। প্রায়ই মেসে আসত তাই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হঠাৎ একদিন আমার আগরতলার বাসায় হাজির। খবর নিয়ে জানলাম বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠের শিক্ষক। অবসর নিয়ে আগরতলায় আছেন তিন মেয়ে একছেলে নিয়ে। ছেলে B.Com পড়ে Hons. নিয়ে। আমি ছেলেটিকে দেখি। ওনার বড় আশা ছেলেটিকে চার্টার একাউনটেন্সি পড়াবেন। আমার ভাল লাগল, কয়েক দিন দেখে বুঝতে পারলাম— ছেলে পাশ করে CA পড়তে পারবে। বড় মেয়ে কলকাতায় Clerkship পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি করছে, অন্য দুই মেয়ে দিদির তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করছে। ছেলেকে নিয়ে যাবে CA তে ভর্তি করাবে। ছেলের জন্য যত্নের কোন ঘাটতি নেই। তারপর আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

সেদিন অসিত বাবুর কাছ থেকে জানতে পারি চিত্তরঞ্জন পালের ছেলে মেট্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কি নিদারুন ঘটনা এত আশা, এত যত্ন, সবই বিফলে গেল। ঠিকানা সংগ্রহ করি বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক-সি পূজা মণ্ডপ ১৩৬ এবং ১৩৬/১ সমীরণ অ্যাপার্টমেন্ট। সেখানে ফ্ল্যাট নিয়ে চিত্ত বাবু সপরিবারে মেয়েদের নিয়ে আছে। মেয়েরা সবাই চাকুরি করে। অথচ একমাত্র ছেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে--কি হতাশা নিয়ে? এমন আমোদে লোক। একবার অসিত বাবুর বিয়ে —আমরা বড়যাত্রী। কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিমে। সে আনন্দের কথা আমরা ভুলব না। একা চিত্তবাবু সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখে।

সুশীল চক্রবর্তী এক সময় এই মেসে ছিলেন। আগরতলায় পড়াশুনা। তিনি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট — বাঁহাতের কনুই থেকে নীচের অংশটুকু নেই। এম.বি.বি. কলেজ থেকে ভাল ফল করে বি.এস.সি পাশ করেন। পরে কলিকাতায় এসে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকুরি নেন। এই মেসে থাকতেন। এত সুন্দর স্বভাব মেসের সবার খুব প্রিয়। আমি পড়াশুনা নিয়ে আছি — তাই অল্পসময়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সুশীল বাবু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট এর পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। তার এক বন্ধু সুনীল কুমার দাশ বেঙ্গাল এজি তে কাজ করতেন। তিনি ডিপার্টমেন্ট এর পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। আমার সঙ্গে সুনীল বাবুর ঘনিষ্ঠতা হয়। ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষায় সাফল্য না

আসায় তিনি কস্টিং এ ভর্তি হন। তারপর মেসে আমাদের পড়াশুনার আসর জমত। ইতিমধ্যে তিনি দিনের বাস সফরে বিহার হুড়ো ফল, জোনার ফল, রাঁচি হাজারীবাগ তোপচাচী লেক। নালন্দা রাজগীর। এই সব সফর মেসের এক ঘেয়ে জীবন যাত্রা নতুন মাত্রা এনে দিত।

আগরতলা থেকে আমার ভাই যদুকে নিয়ে আসায় মেস ছেড়ে আমাকে বেলেঘাটায় আস্তানা নিয়ে চলে যেতে হয়। সুনীলবাবু তখন সেখানে আমাদের সঙ্গে জুটেছে। অবশ্য বেশিদিন ছিলেন না। ভাইটি চলে যাওয়ায় এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। তারপর সুশীলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন। তারপর আমি কলিকাতার পাঠ শেষ করে ফিরে যাই আগরতলায় চাকুরি নিয়ে। কয়েকবছর কেটে গেছে — হঠাৎ একদিন সুশীলবাবু আমার আগরতলার বাসায় হাজির। প্রমোশন নিয়ে আগরতলায়। ইতিমধ্যে ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে গেছেন। বিয়ে হয়েছে — কোন সন্তান নেই। তাই ভাইয়ের মেয়েকে নিয়েছেন। তিন জনের সংসার। মেলার মাঠে কোয়ার্টার পেয়ে সেখানে থাকেন। আমাদের প্রায়ই যাওয়া আসা ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিনিময় হত — কখনও এ বাড়িতে। খুব বেশিদিন ছিলেন না — বছর ২-৩। তারপর কোথায় গেলেন — যোগাযোগ ছিন্ন। আমি ২০০০ সালে কলকাতায় চলে আসি স্থায়ীভাবে। অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিকানা সংগ্রহ করে যোগাযোগ করি টেলিফোনে, তিনি কল্যাণী আছেন। অসুস্থ্য। ফোনঃ ২৫৮২৮১৪২।

সুশীল বাবুর বন্ধুটি দাশ কস্টিং সহপাঠী হয়ে আমাদের পাড়ায় আসর বসত — বিকালে ছুটির পর। আমাদের আলোচনার মাধ্যমে কস্টিং, পড়ায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। আমরা দুই জনেই অল্পসময়ে কস্টিং ইন্টার পাশ করি। তারপর পুরো উদ্যমে আলোচনা চক্র — মেসে অসুবিধা থাকায় সুনীলবাবুর বাড়িতে আলোচনা — তার আদর যত্ন করে বৈকালিক টিফিনের ব্যবস্থা করতেন। পুর্ণ উদ্যমে এ ব্যবস্থা পড়াশুনা চলল। এর মধ্যে আগরতলা থেকে যদুকে নিয়ে আসি। তাই আস্তানা পরিবর্তন পদ্মপুকুরে, দেববর্মার প্রতিবেশী। আলোচনা চক্র পূর্বের মতো বসত। পড়াশুনায় অনেক এগিয়ে গেছি — ফাইনাল গ্রুপ এর প্রস্তুতি।

এদিকে বন্ধু সুনীল দাসের বিয়ের দেখাশুনা হচ্ছে — আমার বিশেষ বন্ধু সুবোধ পালের বোন ইতুর সঙ্গে। আমার পদ্মপুকুর আস্তানা দেখাশুনার ব্যবস্থা হয়। প্রাথমিক অনুমোদনের পর কোথায় যেন দেনা পাওনা নিয়ে সাময়িক মনোমালিন্য। তারপর বিবাহ। ইতিমধ্যে আমার কস্টিং পড়া শেষ হয়ে যায়। সুনীল দাশ ও পাশ করে। বর্তমানে এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ইতি ৫০/১ গড়ফা রোড, ফ্ল্যাট ২০৪, কোলকাতা-৭৫ এ আছে। আমার বন্ধুটি নেই। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার বাইরে আছে। মেসের আর এক সহকর্মী হরিশঙ্কর পোদ্দার একসময় শিক্ষকতায় ছিলেন। তারপর একদিন চাকুরি ছেড়ে সি.এ-তে ভর্তি শ্বশুর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে। তখন এই মেসে আমাদের সহবাস। অল্পসময়েই সি.এ পাশ করে চাকুরি ও টিউশনি। তারপর প্র্যাক্‌টিস এ নেমে পড়ে পার্টনার হয়ে। পিটার এন্ড হেরিস - হিন্দুস্তান বিল্ডিং-এর পেছনে। একজন প্রতিষ্ঠিত সি.এ। ফ্ল্যাট, গাড়ি করেছেন। থাকেন উল্টোডাঙ্গা শিশুনিকেতনের পাশে। কয়েকদিন আগে আমাদের এক বন্ধু আলোক বসু (রেলওয়ে বোর্ডে) দিল্লি থেকে এসে এক মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেন, ভজহরি মান্না, পোদ্দার উপস্থিত। আমরা একসঙ্গে অনেক পুরানো আলোচনায় আসর মুখর।

আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এই মেসে থেকে ল'পাশ করে গেছে। আগরতলায় একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল। বন বলত এখান থেকে কতজন শিক্ষক, সি.এ., উকিল হয়ে বেড়িয়ে গেছেন — এবাব কষ্ট একাউন্টে। অপাতবাবু দরজা বন্ধ করে ওদের সামনে বক্তব্য রাখতেন — মি লর্ড.................. এইভাবে তার অনুশীলন চলত। অনেকে বাহির থেকে উপভোগ করতেন। আগরতলা আমার বাড়ির উল্টোদিকে থাকেন রাইমোহন সাহা। তাব বড়ছেলে শান্তি সাহা। আমার পাশের সিটে ছিল। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কাজ করত। এম.কম পড়ছিল। এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে অবসর জীবন যাপন — যাদবপুর পোস্ট অফিসের কাছে। কয়েকদিন হল একটি দুঃসংবাদ পাই। একমাত্র বিবাহিত মেয়ে বেড়াতে এসে বর্ধমান আত্মীয় বাড়ি যায়— ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। তারপর ফোনে সমবেদনা জ্ঞাপন। আমার স্থায়ী প্রতিবেশী সবাইর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে।

এছাড়া আরো অনেকে যুক্ত ছিলেন এই মেসের সঙ্গে যেমন হরিপদ ভৌমিক, গোপেন্দু চৌধুরী। এরা অবশ্য আগে ছিলেন — মেসে যাওয়া আসা ছিল।

আর এক জনকে পেয়েছিলাম মন্টু সাহা — খুব আপনজন। তার দাদা এখন সি.এ পাশ করে বেড়িয়ে গেছেন। এ নিয়ে গর্ব করতেন। তিনি কস্টিং নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাশ করে দুর্গাপুরে চাকুরি নিয়ে আসেন। ২-৩ বছর হয় দুর্গাপুর যাই - দুর্গাপুর অব কস্ট একাউনটেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে। তখন দেখা খুব আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেই। কথা দিয়েছি আবার এলে যাব। কিন্তু খবর পেলাম তিনি নেই। খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার সদগতি কামনা করি। এই মেসের কাহিনি লিখতে মন আজ ভারাক্রান্ত। সেদিন মেসে গিয়ে দেখি—মেসের কোন অস্তিত্ব নেই। সবই আছে — কিন্তু আমাদের সাধের মেসটি নেই।

তারাপীঠের মাহাত্ম্য

তারাপীঠ বেড়াতে যাব অনেক দিনের বাসনা ছিল। সময় সুযোগ হয়ে উঠছেনা। ৩রা মার্চ ও ৪ঠা মার্চ ২০০৭, শনিবার ও রবিবার দোল উপলক্ষ্যে ছুটি ছিল — আমার ছেলে ভাস্করের। তাই সুযোগ এসে গেল। ভাস্কর অফিস থেকে গাড়ি নিয়েছে - টাটা সুমো (air conditioned) আমরা ৫ জন — আমি সস্ত্রীক, ভাস্কর, বিয়াস ও বৃষ্টি। ৩রা মার্চ ভোরে ৮টা নাগাদ বেড়িয়ে পড়ি।

চন্ডিতলা, সিঙ্গুর, বর্ধমান, পানাগড়, দুর্গাপুর হয়ে বেলা ১টা নাগাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছি। দোল উৎসব উপলক্ষ্যে কোন হোটেলেই জায়গা পাওয়া গেল না। অবশেষে হোটেল Emolic এ একটা রুম পাওয়া গেল। তাতেই খাওয়া সেরে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করলাম।

ভাস্কর ইতিমধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে হোটেল "উৎসবে" দুটি রুমের ব্যবস্থা করে। তারপর সেখানে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। শান্তি নিকেতন থেকে ৩/৪ কিলোমিটার দূরে — শ্রী নিকেতনের কাছে।

রাত্রির মত সেখানে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ভোরে আমরা রওনা হব তারাপীঠের উদ্দেশ্যে — শান্তিনিকেতন থেকে ৬০/৭০ কিলোমিটার।

৮টা নাগাদ বেড়িয়ে পড়ি— সিউড়ি শহরের উপর দিয়ে যেতে যেতে শহরের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। ১০টা নাগাদ তারাপীঠ পৌঁছে যাই। বীরভূমের গ্রামের পরিবেশের মাঝে এই তারাপীঠ তীর্থ স্থান। অধুনা এখানে অনেক বড় বড় হোটেল হয়েছে - 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি।

তারাপীঠের তারা মা একান্নপীঠের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও প্রাচীনকাল থেকে

তারাপীঠের খ্যাতি, মহাপীঠ হিসাবে পরিচিতি - সর্বজনবিদিত। এর নেপথ্যে আছে বামাক্ষ্যাপা সহ্ বহু সাধকের সাধনার সিদ্ধিলাভের ইতিহাস। তারা মায়ের অপার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে বহু লোকশ্রুতিতে। লেখা হয়েছে বহু বই। তাতে তারা মায়ের স্বতন্ত্র ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় রূপালী পর্দায় চরিত্রকে যেমন জীবন্ত তুলে ধরেছে নানা অভিজ্ঞতায়। তেমনি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় প্রচলিত জনশ্রুতিতে ও প্রকাশিত গ্রন্থে। শ্রেষ্ঠী জয়দত্ত তারাপীঠ মন্দির নির্মাণ করেন। তার আগে বলিষ্ঠ দেব সিদ্ধি লাভ করেন। তারাপীঠের অসংখ্য সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সময়ে সাধক সাধিকার সিদ্ধিলাভ। তারাপীঠের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব পেয়েছে আপামর জনসাধারণের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা যথারীতি পান্ডার সঙ্গ নিয়ে মন্দিরের দিকে যাই। ১ কিলোমিটারের ওপর দীর্ঘ পথ, দুই ধারে দোকানপাট পূজার বিভিন্ন সামগ্রী সাজিয়ে বসে রয়েছে — আর পূণার্থীদের ডাকছে, আমরা পান্ডার নির্দ্ধারিত দোকানে ভোগের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করি। মন্দির এর উদ্দেশ্যে রওনা হই, কিছুদূর গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। দীর্ঘ এক কিলোমিটার লাইন — মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে বামে জীবত কুন্ড দর্শন করে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এই জীবিত মাহাত্ম্য জানতে গিয়ে, সাধক বামাক্ষ্যাপা ও তারামায়ের অনেক অলৌকিক তথ্য জানতে পারি।

বীরভূম জেলা খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এখানে বহুগায়ক শিল্পী ও ভক্তেরা জন্মেছিলেন। ১৯ শতাব্দীতে বীরভূমের পবিত্রতা ও খ্যাতি বাড়িয়েছে, সাধক বামাক্ষ্যাপা হিন্দুদের ৫১ পীঠের মধ্যে ৫টি বীরভূমে। রাজা দশরথের কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির "সিদ্ধাসন" ও তারামায়ের অধিষ্ঠান এই তারাপুরে বশিষ্ঠ মুনির এই সিদ্ধাসনে নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ এবং বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছেন। বামাক্ষ্যাপার বাস্তুভিটা "আটলা" গ্রাম - এখান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। এই তারাপীঠে সতী দেবীর নয়নের তারা পড়েছিল—তাই তারাপুরের নাম হয় তারাপীঠ। রামপুর স্টেশন থেকে ছয় মাইল দূরে দ্বারকা নদীর তীরে এই তারাপীঠ। প্রবাদ আছে রত্নগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক রমাপতি নৌকায়

করে তার পুত্রকে নিয়ে আসেন তারাপুরে বাণিজ্য করতে। সেখানে পুত্র সর্পাঘাতে মারা যায়। পরদিন পুত্রেব সংকাব করবেন — ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন সময় ভৃত্য বাজু ছুটে এসে বণিককে নিয়ে যায় — তারাপীঠের একটি পুকুরের ধারে। সেখানে বণিক দেখলেন এক অলৌকিক দৃশ্য—মরা মাছগুলি পুকুরের জলের ছোঁয়ায় বেঁচে উঠেছে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

তিনি পুত্রের শবদেহ সেখানে নিয়ে আসতে বললেন। সবাই মিলে মরদেহ জলে ছুঁড়ে দেয়। তখনই পুত্র বেঁচে উঠে। বণিক রমাপতি ভগবানের এই মহিমায় মোহিত হয়ে পড়েন সেদিন থেকে এই পুকুরের নাম 'জীবিত কুন্ড' পুকুরের পাশেই ছিল একটি ভাঙ্গা মন্দির, সেখানে দেখতে পাবেন চন্দ্রচূড় অনাদি শিবলিঙ্গ ও তারামায়ের মূর্তি। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে মন্দিরটির সংস্কার করেন। তারপর বণিক ভক্তিভরে চন্দ্রচূড় শিব ও তারামার পুজো শেষ করে পুত্রকে নিয়ে সানন্দে দেশে ফিরে যান। তারামার মন্দির খুবই প্রাচীন সিদ্ধ পীঠ।

সেই সময় তারাপীঠ বীরভূমের রাজা আশাদুল্লা খাঁর অধীনে ছিল। মুসলমান রাজারা হিন্দু দেব দেবীর পূজা নিতে চাইতেন না। এদিকে পাশে মহারানি ভবানী ছিলেন নাটোরের কর্মী। তিনি খুব ভক্তিমতি, দয়াবতী ছিলেন। স্বপ্নে তারা মার আদেশ পেয়ে, তিনি নিজের মৌজার বদলে, তারাপুর তার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। রাজস্ব থেকে মন্দিরের যাবতীয় খরচ বহন করার ব্যবস্থা করেন। এখনও এই ব্যবস্থা রয়েছে।

যুগে যুগে মাহাত্মদের জন্ম হয় দেশ ও জাতির হিত সাধনের জন্য। একদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব দক্ষিণেশ্বর, আরেক দিকে তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধক বামাক্ষ্যাপার আবির্ভাব ঘটে। অবতার ছিলেন বলেই তিনি বামাবতার ভগবান সৃষ্টি করেছেন মানুষকে তার সর্বশক্তি দিয়ে। যারা আত্মসন্ন্যাসী তাদেরই তিনি দূত রূপে জগতে পাঠান, দেশ এবং জাতিকে কলুষতা থেকে উদ্ধারের জন্য। বামাবতার ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি জয়তারা ধনীতে দেশকে জাগিয়ে তোলেন। বশিষ্ঠ

মুনির পঞ্চমুন্ডির আসনে তিনি তারামার দর্শন পান দ্বারকা নদীর পূণ্য প্রবাহে বাংলার মাটিতে পবিত্র করে তুলেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা।

১২৪৪ সালে ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দ্দশীর দিন তারাপীঠ থেকে ৩ মাইল দূরে আটলা গ্রামে তিনি জন্মালেন। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খুব ধার্মিক ব্যক্তি। আর মাতা রাজকুমারী ও ধর্মপরায়ণ সাধ্বী ছিলেন। তাদের চার কন্যা ও দুই পুত্র—বামাচরণ ও রামচরণ। কোন রকমে দুঃখ কষ্টে তাঁদের দিন চলে যেত। অভাব অনটন লেগেই থাকত। তবু সর্ব্বানন্দ আনন্দেই থাকতেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাঁরা মায়ের গান গেয়ে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতেন।

পাঁচ বছর বয়সে বামাচরণের মধ্যে ঐশ্বরিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাঁরা মায়ের মূর্তি বানিয়ে নিজের চুল ছিঁড়ে মায়ের চুল দিতেন, জবাফুল জোগার করে ভক্তিভরে তাঁরা মায়ের পুজো করতে থাকেন একমনে। এভাবে শিশু বড় হতে থাকে। বাবা সর্ব্বানন্দ যখন করুনসুরে বেহালা বাজাতেন তখন বামা ভাবে বিভোর, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসতো। বামাচরণের পৈতা হয় ১১ বছর বয়সে। কিছুদিন পর পিতৃ বিয়োগ হয়। বামার ধ্যান ধারনা সব উলোট পালট হয়ে যায়। মামার বাড়িতে গরু চড়ানো, ঘাস-কাটা, গোবরে ঘুঁটে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে ২ ভাইয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। একবার কাজের গাফিলতির জন্য মামা ছড়ি দিয়ে খুব মেরেছিলেন বামাকে। বামা পালিয়ে মার কাছে চলে আসে, আর রামচরণ ভাল গাইতে পারতো তাই এক বৈরাগী গানের জন্য তাকে নিয়ে যায়।

প্রবল বৈরাগ্যের ঝড়ে ব্রহ্মচারী সাধক বামার সংসারের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। জাগতিক জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ ঠেলে ফেলে দিয়ে সেদিন ছুটে গেলেন তাঁরাপীঠে মহাশ্মশানে। দ্বারকার পূর্ব পাড়ে অতীতে এই মহাশ্মশানের বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক ও বিশাল। ঘন গভীর অরণ্য। চারিদিকে জুড়ে রয়েছে গম্ভীর নিস্তব্ধতা, দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সূর্য্য কিরণের প্রবেশ নিষেধ। চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ

ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প। কুকুর শিয়াল অসংখ্য বন্য প্রাণী ভরা ছিল এই পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী মহাশ্মশানে।

রাতের অবস্থা ছিল আরো মারাত্মক আরও ভয়ঙ্কর। গ্রামের হতদরিদ্রের ফেলে যাওয়া শবদেহ নিয়ে শিয়াল কুকুরের কোলাহল, প্যাঁচার ডাক, শকুনের বিকট চিৎকার, বিষধর সর্পের নির্বিকার বিচরণ সব মিলে এক ভৌতিক পরিবেশ বিরাজ করত এই মহাশ্মশানে। দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশানে ভাঙ্গা ঘাটের কাছে কৈলাস পতি বাবার কুটির তারই চরণে আছড়ে পড়লেন ভাবোন্মত বামাক্ষ্যাপা। তখন থেকেই শ্মশানে থাকতেন। এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলেন মহাপুরুষ কৈলাসপতি বাবা। আশ্বাস দিয়ে বললেন "অস্থির হয়ো না বাবা" ব্রহ্মময়ী তারা মায়ের কৃপা লাভের উত্তম ও যথার্থ অধিকারী তুমি। যে পরম ধনের জন্য তোমার ওই ব্যাকুলতা, অচিরেই তা মিলবে।"

বাংলা ১২৬৬ সাল (১৮৫৯ সন) সেই শুভদিন থেকে বামা চিরতরে রয়ে গেলেন তারাপীঠে ভয়ঙ্কর এই মহাশ্মশানে। এখানে অনেক মহাপুরুষ, মহাসাধক তারাপীঠে ভৈরব বামাক্ষ্যাপার সাক্ষাতে কৃপালাভ করে, উত্তরকালে তান্ত্রিক সাধক হিসাবে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এরা সবাই বামাক্ষ্যাপার কৃপালাভে ধন্য। তন্ত্র সাধনার বহু নিগূঢ় সাধন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেন। বামাক্ষ্যাপার সক্রিয় সহযোগিতা ও করুনায়। তারা সবাই ভারতবিখ্যাত মহাসাধক পূর্বাশ্রমের বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর জীবনে মাধবানন্দ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরুভ্রাতা ভগবান গাঙ্গুলীর প্রিয় শিষ্য দেড়শ বছর বয়সে তারাপীঠে মহাশ্মশানে বামাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ লাভ করেন। বামার বয়স তখন ৩৯। উচ্চ কোটির মহাপুরুষ মাধবানন্দ পরম আদরে তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন সিদ্ধপুরুষ শ্মশান ভৈবর খ্যাপা বামা।

এছাড়া অসংখ্য সাধক মনীষী এসেছিলেন তারাপীঠে। ধন্য হয়েছিল

বামাক্ষ্যাপার চরণ স্পর্শে, যাদের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এছাড়া পন্ডিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী বামাক্ষ্যাপার সান্নিধ্যে এসে কৃপালাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫ বছর বয়সে কবি চরণ দাশের সঙ্গে তারাপীঠে গিয়েছিলেন—কৃপালাভ করেন। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ (১৯ বছর বয়সে) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আরো অনেকে। পূর্ণিমা ছিল সেদিন। পঞ্চমুন্ডির আসনে কয়েকজন বসে আছেন। পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন বামা। নগেন কাকা ছিলেন বামার সাধন পথের অন্তরঙ্গ সাথী। একবার বামা শ্মশানে বসে গাঁজা খেয়ে অসাবধানে সেই গাঁজার আগুন এক খড়ের গাদায় পড়ে। সেই থেকে আগুন গ্রামে ছড়িয়ে অগ্নিকান্ডের রূপ নেয়। বামাকে সন্দেহ করে সবাই তার পিছনে ধাওয়া করে। নিরুপায় বামা প্রহ্লাদের নাম করে আগুনে ঝাঁপ দেয়। সবাই হায় হায় করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর আগুনের কুন্ড থেকে বামা বেড়িয়ে আসেন অক্ষত দেহে। সবাই অবাক, উপলব্ধি করল - মা তারার যোগ্য ছেলে কি আগুনে পুড়তে পারে, বামা দৌড়ে পালিয়ে আট লায় মার কাছে। শুরু হল সাধক জীবন। সেই যে বামা ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। দেবী পূজাতে বামা চরণের পরম উৎসাহ। কোন বিধি বিধান, তন্ত্রমন্ত্র ও শুদ্ধাচারের বালাই নেই। চাঁপা, করবী, ঘেট, ফুল — পথ চলতে চলতে মিলে, তাই কচুপাতায় সাজাইয়া তারা মায়ের নামে অর্ঘ নিবেদন করে দিন কাটে। "মা তারা" নিনাদে গ্রামের পথ ঘাট মুখরিত হয়। স্বভাব সরল বামার জীবনের সাথে ওতপ্রোত হয়ে উঠে তারা মা এর দিব্য সত্তা। সবার অজান্তে নিজের অজ্ঞাতে তরুণ সাধক হয়ে ওঠেন তারাময়। পাগল বামা চরণ তারা মায়ের পায়ে চড়িয়ে দেন রাশি রাশি বনফল, আর বেলপাতার অঞ্জলী। তারাপীঠের শ্মশানে তখন বহু তন্ত্র সাধকের আনাগোনা। প্রধান কৌলপদে তখন ছিলেন মোকদানন্দ। সিদ্ধ মহাপুরুষ কৈলাসপতি বাবা সেখানে উপস্থিত। তারাপীঠে গেলেই বাবাচরণ এই মহাত্মাদের স্নেহ ও সাহচর্য্য লাভ করিয়া ধন্য হন। কৈলাসপতি বাবার দিব্য দৃষ্টি সজাগ সতর্ক প্রহরীর মত তাহাকে বেষ্টন করে। তার হৃদয় অধিকার করে আছে। অজানা অঘোর আকর্ষণে বাবা কৈলাসপতি বার বার মহাশ্মশানে বাবার সেবা ও পরিচর্য্যার লোভে।

তারা মায়ের জন্য বামা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। লোকে তাকে ক্ষেপা বলে ডাকে।

তারা মায়ের ছেলে তারা মায়েরই সঙ্গে মহাশ্মশানে চিরদিনের জন্য রয়ে গেলেন। আপন ভোলা ক্ষেপার জীবনে দেখা দিল চরম বৈরাগ্য। মহাপুরুষ কৈলাস মহাশ্মশানে আশ্রয় দেন। বামা প্রতিদিন জীবিতকুন্ডে স্নান করতেন এবং কৈলাসপতির সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। বাবা কৈলাসপতি বাবাকে বড় স্নেহের চোখে দেখতেন। কৈলাসপতি বাবার খড়ম পায়ে দ্বারকা নদীর উপর হাঁটা, মৃত তুলসী গাছকে জীবন দেওয়া ইত্যাদি অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অবাক। কালী পূজার রাতে বাবার অভিষেক হয়। সিদ্ধ বীজমন্ত্র পেয়ে বামার সব ওলট পালট হয়ে যায়। তপ জপ করতে থাকেন। শিমূলতলায় ---নানা রকমের উৎপাত হতে থাকে প্রথমে। মেঘের গর্জন, ফাঁকা আকাশে কড় কড়াত আওয়াজ। জীবিত কুন্ডে অসংখ্য মরা মাছের দাপাদাপি, কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস ইত্যাদিতে বামার মন চঞ্চল। দূর থেকে গুরু দেব বলেন "মা ভৈ মা ভৈ"।

শিবচতুর্দ্দশীব দিনে, গুরুদেবের আদেশে বাবা বসেন পঞ্চমুন্ডির আসনে। সকাল গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকাল ও সন্ধ্যা হলো ঘোর অমাবস্যা, চারিদিক থমথমে, অন্ধকার, খাওয়া দাওয়া নেই বামার। রাত দুটোর পর নারীরা কাঁপতে থাকে। সুমিষ্ট ফলের গন্ধে শ্মশান যেন মেতে উঠেছে। হঠাৎ আকাশ ফুড়ে নীল আলোর জ্যোতি ফুটে উঠলো, চারিদিকে আলোর বন্যা বইতে থাকে। সেই আলোর মাঝখানে "তারা মা" দেখা দেন। পরনে বাঘের ছাল, চার হাতের কোন হাতে খাঁজ, কোন হাতে মড়ার খুলির পাত্র, কোন হাতে পদ্ম ফুল, আবার কোন হাতে রয়েছে অস্ত্র। আলতা পরা পায়ে সোনার তোড়া, এলো চুল, মৃদু মৃদু হাসি. জিভ কিন্তু বেড়িয়ে আছে। গলায় জবা ফুলের মালা, সেই মূর্তিকে সামনে দেখে বামা আত্মহারা হন। ভুলে যান সব কিছু। এত অল্প বয়সে বামা সিদ্ধিলাভ করেন। কেবলমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরে।

১৮ বছর বয়সেই বামা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মোক্ষদানন্দ দেহত্যাগের পর বামাচরণ কৌলের (মন্দিরের) প্রধান পদলাভ করেন। সব সময় তারা তারা বলে চিৎকার করতেন।

একবার দ্বারকা নদীতে স্নান করার সময় ওপাড়ে 'হরিধ্বনী' শুনে মায়ের মৃত্যুর খবর জেনে বামা মা মা বলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে পার থেকে মাকে এনে তারা মায়ের সাক্ষাতে জননীর সৎকার করেন এই মহাশ্মশানে।

শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসছে — তিন দিন বাকী। বামা আটলায় গিয়ে রামা চরণকে নিয়ে পাশের জমিতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে বলেন। পাঁচ সাত গাঁওকে নিমন্ত্রণ করতে নির্দেশ দিয়ে আসেন। রামাচরণ পাগলের কথায় কোন ভরসাই করেনি। শ্রাদ্ধের সমস্ত ব্যবস্থা করে শ্মশানে চলে যান। পরের দিন সকাল থেকে নানারকমের খাবার রামা চরণের বাড়িতে আসতে থাকে। ছোট ভাই বামাচরণ ও অবাক। সাধকের কুহক মন্ত্রে শ্রাদ্ধের দিন ব্রাহ্মণ ভোজনের বিশাল আয়োজন। পাঁচ সাত গ্রামের লোক পেট ভরে শ্রাদ্ধের লুচি, তরকারী মিষ্টি মন্ডা খেয়ে আশীর্বাদ জানাল। এরকম অনেক অলৌকিক কাহিনি রয়েছে।

বশিষ্ঠ দেবের পঞ্চ মুন্ডির আসনে বসে বামা জপ করতে থাকেন আর বলতেন "জপাৎ সিদ্ধি"। কলিযুগে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করতে হলে জপই একমাত্র উপায়। কৃষ্ণাষ্টমীর সেই ভয়ঙ্কর দিন মহাযোগী মগ্ন হলেন মহাযোগে —ভক্তেরা তারা তারা ধ্বনী কাঁপিয়ে তুললেন শিমূলতলা — এরই মধ্যে জীবনাবসান ঘটে গেল।

বামাবতারের এই অলৌকিক জীবন কাহিনি এর অদ্ভুত প্রভাব অনুভব করলাম। স্মৃতিচারণ (বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে) করতে করতে কখন ৩ ঘণ্টা কেটে গেল খেয়াল নেই। তারপর মন্দিরে ভোগ দিয়ে, হোটেলে আহারাদি সেরে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেই।

সফরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১লা মে ভোবে আমার বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী সস্ত্রীক বর্ধমানের শক্তিগড় স্টেশনের কাছে বড়গুল গ্রামে সন্তোষ চক্রবর্তীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই।

দুপুরে ২টা নাগাদ সেখানে পৌঁছি। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নেই। সন্তোষ চক্রবর্তী নতুন বাড়ি করেছেন। একমাত্র ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। আজ গৃহ প্রবেশ ১লা মে। সেই সাথে একমাত্র ছেলের বিয়ের পার্টি। আনুষ্ঠানিক বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। দক্ষিণমুখো নতুন বাড়ি সামনে রয়েছে পুকুর। সব মিলে বাড়িটির একটি আলাদা সৌন্দর্য্য রয়েছে।

সন্তোষবাবুর একটু পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সন্তোষবাবু আগরতলা MBB কলেজে বাংলার প্রফেসর ছিলেন। আগরতলা কর্ণেলবাড়ির মেয়ে রুবি দেবীকে বিয়ে করেন। কলেজে কাজ করার সূত্রে শ্যামাবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাঝে মাঝে রুবি দেবী শ্যামাবাবুর বাড়িতে আসতেন। সেখানেই আমার পরিচয়। আমার ফ্ল্যাটেও এসেছেন। সন্তোষবাবু চাকুরিতে অবসর নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে আসেন— বর্ধমানে আগে শক্তিগড়ের কাছে বড়গুলগ্রামে। তারপর নতুনবাড়ি ছেলে, বিয়ে ইত্যাদি, সন্তোষবাবুর ২ ভাই, একজন স্কুল শিক্ষক, অপরজন হুগলী মহসীন কলেজের প্রফেসর।

সন্ধ্যায় শ্যামাবাবুর সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ি। হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের মোর পর্যন্ত যাই। সেখানে কিশোরী মোহন সাহার সঙ্গে পরিচিত হই। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, বড়গুল গ্রামের আদিবাসী। আলোচনায়, বড়গুল গ্রামের মোটামুটি ইতিহাস জানতে পারি। ডাঃ বিধানচন্দ্র এটাকে একটা শিল্প নগরী তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বাধীনতার কিছু কাজ কর্ম হয়। অনেক শিল্প এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতায় তারা হাওড়ার দাশনগর অঞ্চলে শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারেনি। আস্তে আস্তে প্রায় বিলীন। এখনও কয়েকটি তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্তোষ চক্রবর্তীর বাড়ি মিলগেটে নেমে রাস্তার উত্তর পাশে রাস্তার সংলগ্ন সামনে দক্ষিণ খোলা—বিরাট পুকুর, তারপর রাস্তা পূর্ব পশ্চিমে - পূর্ব দিকে বর্ধমান আর পশ্চিমে মাইল ২ দূরে রয়েছে দামোদর বাঁধ। ঢাকা থেকে আসা কিশোরী সাহা আমাদের মত শ্রোতা পেয়ে আনন্দে, এগ্রামের একটা একটা পুরো ইতিহাস আমাদের বললেন।

৩রা মে পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা ২ বন্ধু প্রাতঃ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ি দামোদর নদীর দিকে। পথে ধর্মতলা - মোটামুটি একটা ছোট বাজার বলে মনে হয় — অনেক দোকান প্রসার রয়েছে আর একটু অগ্রসর হয়ে আমরা দামোদর নদীর পাড়ে যাই। নদীতে জল নেই — শুধু বালি - আর সারি সারি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বালি সংগ্রহের জন্য। আমরা সেখান থেকে বাসে করে ফিরে আসি।

আজ কোথাও বাহিরে যাওয়ার প্ল্যান নেই, মিঃ ও মিসেস চক্রবর্তীর অনুরোধে যাওয়া স্থগিত। বিকালে সান্ধ্য ভ্রমণে শক্তিগড় স্টেশনে যাই-তিন কিলোমিটার সেখানে আমরা শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা খেলাম। তেমন একটা ভাল মনে হলো না। তারপর বাসে বড়গুলে ফিরে আসি।

৩রা মে বর্ধমান যাওয়ার প্রস্তুতি। আমরা স্নান সেরে Breakfast খেয়ে তৈরি হয়ে নিই। সেখান থেকে ৯টা নাগাদ বর্ধমান পৌঁছে যাই। তারপর রিক্সা নিই ৭টাকা করে, ২ রিক্সায় আমরা তারাবাগ পৌঁছে যাই। কিছু খোঁজ খবর নিয়ে প্রফেসর অশোক হুইর ফ্ল্যাটে যাই। তিনি অসুস্থ। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাই তাদের কথাবার্তা আর শেষ হয় না। তারপর বিশ্বজিৎ ঘোষের খবর নিই। আগরতলায় আমার বন্ধু রঞ্জিত ঘোষের ছেলে এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের Socialogy dept. এর Head অপর ভাইটি Chartered Accountant, সল্টলেকে থাকে। রঞ্জিত ঘোষ গান বাজনা নিয়ে আছে — ধলেশ্বর স্কুলে— রেডিওতে গান গায়। কিছুদিন হয় তিনি দেহত্যাগ করেছেন। খবর পেয়ে যাই একজন সহকর্মী তথা MBB কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এখন ছেলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। তিনি Guest Houseএ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রফেসর হুই এর সেখানে কিছুক্ষণ কাটাবার পর হুইয়ের ছোট

মেয়ে মুন্নাকে নিয়ে Guest Houseএ আসি। ৩ জনের ঘর, দোতালায় ২০ নং এ থাকবার ব্যবস্থা হল। চমৎকার পরিবেশ।

আমরা যখন বর্ধমান শহরে ঢুকলাম — প্রথমেই বীরহাটা পরপর স্পন্দন কমপ্লেক্স, পাতাল বাজার, চৌধুরী বাজার, রামকৃষ্ণ রোড, কলেজ, কৃষ্ণসায়র হয়ে তারাবাগ পৌঁছলাম — বিরাট বিরাট কমপ্লেক্স। একটা বিরাট জলাশয়ের পাশে রয়েছে অতিথিশালা।

পুরানো রাজবাড়ি — বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা মত এটাকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছে—তাতে রয়েছে (১) তারাবাগ হাউসিং কমপ্লেক্স (২) গোলাপ বাগ মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ যেমন Humanities, Commerce Management Science, Engineering Law, Computer, Journalism & Medicine etc. (৩) Administration building —সেখানে Vice-Chancellor থাকেন এর administration এর মূল অফিস। রাজবাড়ির মূল দালানটিতে রয়েছে Musium.

সন্ধ্যা ৫টায় আমরা তিনজন প্রফেসর হুই এর মেয়ে মুন্নাকে দিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। প্রথমে ১০৮ শিবমন্দির। তারাবাগের গেট থেকে রিক্সা নিয়ে বাসস্ট্যান্ড যাই। সেখান থেকে রিক্সা নিয়েই ১০৮ শিবমন্দিরে যাই। রাস্তার ডান পাশে মহারানি বিষন দেবী ১৭৮৯ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে এই মন্দিরের সমস্ত দায় দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার Trust এর উপর অর্পিত হয়। এখন সমস্ত বিষয়ে দেখাশুনার দায়িত্বে আছেন এই Trust মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতে হয় — এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য দর্শকদের মনে দাগ কাটবে। এই মন্দির পূর্ব পশ্চিমে লম্বা সামনে ও পিছনে ৪০টি করে ৮০টি পূর্বে পশ্চিমে ১৪টি করে। মাঝে পাশাপাশি ৩টি মন্দির শিবের।

সেখান থেকে আমরা বাসে বর্ধমান শহরে চলে আসি। বাসস্ট্যান্ডের কাছে— দোতালায় কালীমন্দির সেখান থেকে ৮ টাকা করে রিক্সা নিয়ে যাই সর্বমঙ্গলা মন্দির। পথে বিশাল কার্জন গেট। সন্ধ্যাআরতী হয়ে গেছে। আমরা চারিদিক ঘুরে দেখলাম। তারপর রিক্সায় বড় বাজারের ভিতর দিয়ে তারাবাগ গেটে এসে নামি।

৪ তারিখ সকাল ৯টায় ব্রেকফাস্ট সেরে Guest House থেকে বেড়িয়ে পড়ি। তারাবাগ থেকে Bridge পেরিয়ে, রাস্তায় উঠি। ডানদিকে ঘুরে রাস্তার উপর বায়ে রয়েছে গোলাপ বাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ। প্রথমেই Medicinal Plant এর বাগান। পিচের এই রাস্তা গোলাপ বাগের দক্ষিণ সিমানা। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা, পশ্চিম সীমানায় Statistic আর পূর্ব সিমানায় Law dept. মাঝখানে রয়েছে Dept. of Humanities গোলাপ বাগের পশ্চিম দিক দিয়ে Static dept. এ পাশ দিয়ে ভিতরে উত্তর দিকে যাই। বাঁদিকে পাই Dept. of Zoology। বাঁদিকে পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে এগিয়ে গেলেও পাড়ে রয়েছে Academic Staff কলেজের placement এবং Welfare dept. পশ্চিম পাড় দিয়ে উত্তরে গিয়ে পেলাম Dept. of Geography. এই পুকুরটি বাঁধানো ও বেশ বড় উত্তর পাড়ে Physics dept ও Mathmatic dept পুকুরের পাড়ে পাশে রয়েছে বিভিন্ন Dept. এবার পিচের রাস্তা দিয়ে পশ্চিম সীমানায় — প্রথমে পাই Dept. of Chemistry.

এই প্রশস্থ পীচের রাস্তা গোলাবাগের চারিদিকের সীমানা নির্ধারণ করেছে। ভিতরে রয়েছে সংযোগ রাস্তা বিভিন্ন Dept. এর সঙ্গে। তারপর খাল ও ঝিল উত্তর সীমানায়। উত্তর পশ্চিম কোণে ঝিলের ওপারে রয়েছে Institute of Technology Campus বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে। পূর্বদিকে অগ্রসর হলে আমরা পাই Dept. of Botany, তারপর পূর্ব উত্তর প্রান্তে Budwan Universityর Auditorium. তারপর পূর্ব সীমানা ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাই, দক্ষিণ সীমানায় পীচের বড় রাস্তায় উঠে আসি গোলাপবাগের দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় প্রথমে। Law Dept তারপর Dept. of Humanities. তারপরে আসি Dept. of Statistics.

গোলাপ বাগ দেখে আমরা Law Dept এ আসি। সেখানে আমাদের চিরপরিচিত মানিক চক্রবর্তীকে পাই। মানিকবাবু ক্লাসে ছিলেন। Chamber এ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মানিকবাবু আসেন। অনেকদিন পর দেখা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে উভয়ে মুগ্ধ — কোলাকুলি। তারপর আগরতলার খবরাখবর। চাপ্টারের খবর।

মানিকবাবু দিল্লির থেকে Law তে মাষ্টার ডিগ্রি নিয়ে আগরতলা Law কলেজে Join করেন। গল্প করতেন ঘোড়ায় চড়ে পাঞ্জাবী মেয়ে সতী দেবীকে বিবাহ্ করেন। সতীদেবী Law তে মাষ্টার ডিগ্রি করেছিলেন। মানিকবাবু বিলোনীয়ার বাসিন্দা। মানিকবাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। এরা দুই জনেই আগরতলা চাপ্টারের সঙ্গে যুক্ত Law এর শিক্ষিকা পরে সতী Law নিয়ে কোর্টে ওকালতি করেন। তাদের ২ ছেলে পড়াশুনা করত। চাকুরিতে মানিকবাবুর আগ্রহ নেই। শিক্ষার দিক থেকে মর্যাদা পেতেন না। বাহিরে চেষ্টা করার জন্য আমি খুব উৎসাহ দিতাম। পরে বর্ধমান কলেজে যোগদান করেন। তারপর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। দক্ষিণ কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কয়েকজন Inst এর মেম্বার রয়েছে। মানিকবাবু খবর পাঠান। পাঁচজন কষ্ট একাউন্টেন্ট এখানে রয়েছেন। উজ্জ্বল মল্লিক Head of the Dept. Commerce. উজ্জ্বল দত্ত, স্বপন কুমার বিশ্বাস, দেবদাস রক্ষিত ও গৌতম মিত্র। উজ্জ্বল মল্লিক আমাদের Institute এর Journal এ লিখতেন। তার এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে Tata Consultancyতে কাজ করেন। ছেলে advocate, আমার জামাতার ঠিকানা দিই। তারপর ১২টা নাগাদ Guest House এ ফিরে আসি সন্ধ্যায় কৃষ্ণ সায়র দেখতে গেলাম। গেট থেকে রিক্সা নিয়ে চলে যাই। ৪ টাকা দিয়ে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ্ করি সায়র লম্বায় ১ কিলোমিটার। পাশে আধা কিলোমিটার। চারিদিক ঘুরে আসলাম। পথে "রূপালী নীড়" (aquarium) "সৃজনী" নতুন আর্ট কলেজ রয়েছে। আর রয়েছে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা, ২ জন আধ ঘণ্টা, করে ঘুরে আসি। প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা প্রতি টিকেট পিছু নৌকাভ্রমণ, শেষে পায়ে চালানো নৌকা সন্ধ্যা ৮টায় Guest Houseএ ফিরে আসি।

ভোর ৫টায় উঠে আমি ও শ্যামাবাবু বেড়িয়ে পড়ি। আমাদের প্রথম ও শেষ গন্তব্যস্থল হল কঙ্গলেশ্বর মন্দির। একটি রিক্সা নিয়ে আমরা রওনা হই। আসা যাওয়া ৩০ টাকা। পুরানো মন্দির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। গ্রামের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে আমরা ১টায় ফিরে আসি। ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা Guest House থেকে স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ি, দুপুর ১২টা নাগাদ কলিকাতায় পৌঁছে যাই।

আদ্যাপীঠ দর্শন

৫ই আগস্ট ভোরে নির্দিষ্ট সময়ে ভাস্করের অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা ৪ জন আমি সস্ত্রীক, বিয়াস (বৌমা) ও নাতনি ছেলে ভাস্কর সকাল ৮টা নাগাদ বেড়িয়ে ৯.২০ মি নাগাদ মন্দিরে পৌঁছে যাই। যথারীতি প্রসাদের জন্য ১২ টাকা করে ৫টি টিকিট সংগ্রহ্ করি। তারপর মাতৃমন্দির দর্শন করে অঞ্জলি দেব। ১০টা নাগাদ মন্দির খুলবে। আরতী ও ভোগ প্রদান চলবে ১১ পর্যন্ত, প্রসাদ গ্রহণ ১১.৪৫ মিঃ।

হাতে যথেষ্ট সময় — মন্দিরে বিভিন্ন কাজকর্মের খবরা খবর নিই। রাস্তা থেকে দক্ষিণ মুখো প্রবেশ দ্বার। ঢুকেই বাঁদিকে একটা বোর্ড — এই প্রতিষ্ঠানের একটি মানচিত্র। সেখান থেকেই মন্দিরের বিশালত্বের কিছুটা পরিমাপ করা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আদেশে শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুর শ্রী আদ্যামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমদ্ অন্নদা ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। আদ্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী আদ্যামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ পেয়েছিলেন শ্রীমদ্ অন্নদা ঠাকুর। সেই নির্দেশমত জনসাধারণের সাহায্যে নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

(১) অনাথ বালকদের জন্য আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম। এখানে ৩৫০ জন দুঃস্থ বালক থাকা খাওয়ার ও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(২) দক্ষিণেশ্বর বালিকাশ্রমঃ ৪৫০ জন দুঃস্থ বালিকাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য দক্ষিণেশ্বর বালিকাশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়।

(৩) মনিকুন্তলা বালিকা বিদ্যালয় - প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক।

(৪) সংসার বিরাগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পৃথক সাধক ও সাধিকাশ্রম এখানে ২২০ জন সাধক ও সাধিকার সাত্ত্বিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৫) শিক্ষিকা শিক্ষণ বিভাগ

(৬) সাধারণ শিক্ষণ পাঠাগার।

(৭) স্বামী পুত্রহীনা বিধবা মায়েদের জন্য মাতৃ আশ্রম। ৮৫ জন মায়েদের থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে।

(৮) নিত্য ৫০০ থেকে ১০০০ অতিথিদের প্রসাদ নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ১১.৪৫ মি ভোজনকক্ষে ভক্তরা দৈনিক প্রসাদ গ্রহণ করেন। আশ্রমের বালকেরা, এই পরিবেশনের দায়িত্বে আছে। খুব সুশৃঙ্খলভাবে এই পরিবেশনের কাজ এই ছোট ছোট বালকরা করে যাচ্ছে - কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই।

(৯) নিত্য ৩০০/৪০০ জনের নর নারায়ণ সেবা হয়। তাছাড়া আদ্যাপীঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধীনে চলছে ঃ

* এক্সরে ও ইসিজি ক্লিনিক;

* দন্ত চিকিৎসা বিভাগ।

* ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা।

* জনসাধারণের সুবিধার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা।

* রোগীদের শুশ্রুষার জন্য ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল।

- -- এই বিরাট কর্মকান্ডের পিছনে কাজ করছেন নিস্বার্থ কর্মীদল - যাদের পরিচালনায় রয়েছেন সভাপতি - ব্রহ্মচারী ঋতেন ভাই, রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর সংঘের সম্পাদিকা - ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী - আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা সম্পাদক - দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘের ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই।

এই সব কর্মকান্ডের পিছনে অন্নদা ঠাকুরের ভূমিকা রয়েছে সর্বত্র ছড়িয়ে। পূজনীয় অন্নদা ঠাকুরের কিছু চমকপ্রদ কাহিনি খুবই প্রাসঙ্গিক — আদ্যাপিঠকে জানতে হলে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের কৃপাধন্য শ্রীমদ্ অন্নদা ঠাকুরের মহতী কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে হবে।

প্রবেশপথে ঢুকতেই ডানদিকে রয়েছে মন্দির আর বাঁদিকে রয়েছে মাতৃমন্দির, একটু এগিয়ে রয়েছে অফিস, প্রসাদ পাওয়ার টিকিট ঘর, এর পর রয়েছে গাড়ি ও রান্নার ঘর। তারপর রয়েছে খাওয়ার ঘর, প্রেসিডেন্টের নিবাস। পিছনে উত্তরে রয়েছে গোকুল বালিকাশ্রম স্কুল ও বালিকাশ্রম। এই সব কর্ম কান্ডের মধ্যে রয়েছে অন্নদাঠাকুরের ভূমিকা সর্বত্র ছড়িয়ে। পূজনীয় অন্নদাঠাকুরের কিছু চমকপ্রদ কাহিনি খুব অপ্রাসঙ্গিক।

গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে আমার দেশীয় এক বিদ্যার্থীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে মিত্র মহাশয়ের। পরে ২ জনে ১০০ আর্মহার্স্টস্থ বাড়িতে যাই। সেখানে যতীন্দ্রর সঙ্গে পরিচিত হই। কলকাতায় গিরিশের আশ্রয়দাতা। গিরিশ বলিল যতীন রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শ্রীমার শিষ্যা ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে বেড়িয়ে যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে ফিরে আসবে। ১১ বছর থেকে বিষয় বৈরাগ্যে সে একজন বড় সাধক।

অন্নদা ঠাকুর জানলেন এ বাড়ির ছোট বড় সবাই সাধক, সবাই সৎ। সবারই একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি বহু ভাগ্যে এ বাড়িতে স্থান পেয়েছি। তাদের সঙ্গে কথা বার্তায় বুঝতে পারি এরা কেমন সুন্দর ও পবিত্র চরিত্রের।

মায়ের অসুস্থতা জেনে বাড়িতে গেলাম, বিয়ে হল। খুড়োশ্বশুর শ্রীযুক্ত রসিক চক্রবর্তীর অদ্ভুত স্বার্থ ত্যাগে মা সুস্থ হলেন। সবাই খুশি। এই বাড়ি জুড়ে অধ্যাত্ম পরিবেশ। তাদের আলোচনার কিছু অংশ অপ্রাসঙ্গিক নহে।

একদিন মা বাবার মধ্যে তর্ক। মা বলিতেছেন প্রতিমা পূজার ও দরকার। বাবা বলিতেছেন "কিছু দরকার নেই। ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান। তাকে গন্ডিবদ্ধ করে পূজা কেন? "এসব তোমাদের ভুল ধারনা "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" তা যদি হয় কালী কৃষ্ণ কি ব্রহ্ম ছাড়া? এরকম তর্ক বিতর্ক হত প্রায়ই। আমি নারদ হয়ে ঝগড়ার মীমাংসা করতাম।

বাবার প্রশ্ন এসবের ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে দ্বিতীয় জ্ঞান কিছু আছে কি? আমি একটু হাসিয়া বলিলাম না। আমি বললাম "ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূজা ও তপস্য"।

মা জানতে চাইলে বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা ব্রহ্মসমাজ থেকে যে সব বই বেড়িয়েছে সেসব কি শাস্ত্র নয় না সম্মুখে প্রতিমা খাড়া করে ফুল দুর্বা দিয়ে পূজা না করলে পূজা হয় না। সংসার ছেড়ে কৌপীল এটে বনে না গেলে তপস্য হয় না। বলো আমি বললাম বাবা - সবই সত্যি জানবে ব্রহ্মবিদ্য শিখতে হলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমমুখী শান্ত অভ্যাস করিতে হয়। বিনা ব্রহ্মচর্য্যে আধ্যাত্ম বিদ্যা ধারনায় আসে না। যারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ব্যস্ত তাদের গোঁড়ামী থাকে না। বলেন না যে 'আমি ব্রহ্মবিদ' শাস্ত্র আছে "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। অনেক বোবার সন্দেশ খাওয়ার মতো, আনন্দ শুধু আস্বাধন করেন, স্পষ্ট ভাবে কিছু বুঝতে পারে না এবার মা জিজ্ঞাসা কবলেন "ঠাকুর তুমি এখন বলো দেখি প্রতিমা পূজার দরকার কিনা বিনা প্রতিমা পূজায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায় কিনা?

পুত্র অন্নদাঠাকুর মা কিসে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায়? তা আমার মত অজ্ঞান ও দবের কথা। এ পর্য্যন্ত কোন মুনিঋষি শাস্ত্রকার ও এ বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে পারেননি। তবে তারা একটা পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন—এ পথে চললে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেও হতে পাবে। কেহ কে বলেন জনক ঋষি শুকদেব প্রভৃতি আরো দুই এক জনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। একথা শুনিয়া মা রাজি না। প্রশ্ন ঠাকুব তুমি কি বলতে চাও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্ববিজয়ী কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী এবা কেউ ব্রহ্মজ্ঞানী নয়। একটি পথ অবলম্বন করেছিলেন মাত্র। ব্রহ্মবৎ হলে জড়ভরত হয়ে যেতেন। জড় ভরতের অবস্থা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা শুকদেব নিজেকে খুব উপযুক্ত মনে করে গুরু বরণ করেননি বলে তাকে ও দেবসভায় নির্যাতিত হতে হয়েছিল। নিজেকে খুব চতুর ও বুদ্ধিমান মনে করার জন্য বিষম অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। বোধহয় এসব জানেন।

মা পুনরায় জানালেন — প্রতিমা পূজা সম্পর্কে তোমাকে বলতে হবে। প্রতিমা পূজার উপকারিতা সম্বন্ধে বলো। পুত্র অন্নদাঠাকুর বললেন — মা উপাসনা করতে হলে সদগুণেই উপাসনা করতে হয় আর তা করতে হবে শাস্ত্রসম্মত ভাবে। ব্রহ্ম যখন নির্গুন, নির্বিশেষ, নিরুপাধি, তখন তার উপাসনা কেমন করে সম্ভব?

মনের দ্বারা যখন উপাসক ব্রহ্ম যখন বাক্য মনের অগোচর তখন মন বুদ্ধি চক্ষু ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সেখানে পৌঁছতে পারে না। উপাসকের উপাসনা সে স্থানে যায় কি করে পৌঁছবে? বিশেষত গুরু হবেন কে? যিনি

ব্রহ্মবিদ তিনিই ত ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। পরমহংসদেব বলতে "নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে নেমে আর ফিরে এল না। সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। আবার বিনা গুরু সহায়ে উপাসনা মঙ্গলকর হয় না এ অবস্থায় প্রতিমাদি সাকারে মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম সমুদ্রে প্রবেশ করা ছাড়া জীবের আর উপায় কি। বিশেষত প্রতিমাদির আবির্ভাব ও উপাসকের মঙ্গলের জন্য। যারা প্রতিমাদি না মানবেন তারা ও মানতে পারেন না। কেননা সগুন নির্গুন ব্রহ্ম আর যারা আমরা যাকে মায়া বলি সেই মায়াই প্রকৃতি। আর মায়া উপাধি যুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কখনও নিরাকার হতে পারেন না। ব্রহ্মই গুণময়ী মায়াতে আশ্রয় করে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব উপাধিধারী হয়েছেন এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন তিনি জীবের উপাস্য এবং উপাসনা ফলদাতা নির্গুন ব্রহ্মই কি তবে কিছুই নয়?

তা কেন শাস্ত্রে আছে নির্গুন ও সগুন দুইই সত্য

"নিগুনং সগুনঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রুপ মুচ্যতে

নির্গুন মায়াযা হিনং সগুনং মায়ায়া যুক্তম"

তবে নির্গুনের উপাসনা করা যাবেনা কেন? না বাবা তা যায় না, তা যায় না যেমন আপনাকে উপাসনা করতে হলে আপনার স্থূল ভাগকে উপাসনা করতে হয়। শুষ্ক প্রাণকে নয়। তেমনি যেভাব নিষ্ক্রীয় ও নির্গুন তাহা উপাস্য নয়। তাহা যদি হবে তাহলে সুরাসুরের যুদ্ধে তিনি সাকার হয়ে আবির্ভূত হতেন না। আর সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে যারা অবতার হয়ে আসছেন। তাদেরও আসতে হত না। ব্রহ্ম ইচ্ছাতেই যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি লয় হতে পারত। কেবল উপাসকদের সুবিধার জন্যই ব্রহ্ম শরীর পরিগ্রহ করে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানিভবতি ভারত

অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মনং সৃজন্যমাহম

পবিত্রানায় সাধুনং বিনশায়চ দুষ্কৃতিম

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এই রকম সারগর্ভ আলোচনায় পিতা নির্গুন ব্রহ্ম এবং মা মূর্তি পূজার উপাসনার উত্তর পেয়ে গেলেন। ১০০ নং আর্মহাস্ট স্ট্রিটের বাড়ির পরিবেশ, সচীন গিরিন যতীনের সহচর্য ও ধর্মীয় আলোচনা এক মনোরম আধ্যত্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

একদিন সচীন জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা শাক্ত বৈষ্ণববাদি ভেদে উপাসনা যে পাঁচটি স্থর নির্দেশ করা হয়েছে তার মধ্যে কোন স্তরের সাধক শ্রেষ্ঠ। উত্তরে অন্নদাঠাকুর সে যে স্তরের তার পক্ষে সেই স্তরই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রত্যেক জীবকেই প্রত্যেক স্থর দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে হয়। গন্তব্যে পৌঁছলে স্তরের অতীত হয় তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। সকল স্তরই সমান।

ব্রহ্ম উপাসনা বলে যে পৃথক উপাসনা আছে আমার জানা নেই ব্রহ্ম ছাড়া ও কিছু নেই। আর নির্গুন ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। উপাসনা করতে হলেই সগুনের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয় তাই বেদান্ত সার বলেছেন---উপসনানি সগুন ব্রহ্ম বিষয়ক --মানস ব্যাপাররূপিনী চিত্তবৃত্তি তন্ময় করার নামই উপাসনা আবার বিনা অবলম্বনে চিত্তের তন্ময়তা আসে না। তার প্রকৃত স্বরূপ মানুষের ভাব ও ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আকাশের মতো তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান — চক্ষু কর্ণ মন বুদ্ধি ও যাকে আয়ত্ব করতে পারে না। যিনি জ্যোতির্ময়, প্রেমময় দয়াময় প্রভৃতি সত্তার ভিতর আসেন না। শাস্ত্রকার ও তার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেননি, মুনি ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষের কাছে ও যিনি অব্যক্ত। কী উপায়ে সাধক সেই নির্গুন ব্রহ্মের ধারনা উপাসনা করতে পারেন।

সচীনে প্রশ্ন তবে ব্রহ্ম কি উপাস্য নয়? সগুন ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরই উপাস্য। নির্গুন ব্রহ্ম উপাস্য নয়। তবে নির্গুন ব্রহ্মের জ্ঞান কারো হয় না। সগুনের উপাসনা করতে করতেই নির্গুনের জ্ঞান লাভ হয়।

সচীন এটা জানে ভাবনা না থাকলে লাভ হয় না। আমি বলছি ব্রহ্ম সমাজের ভিতর কেউ ভাবুক নেই।

ভাবুকের লক্ষণ কি?

প্রধান লক্ষণ তিনটি — নির্বুদ্ধিতা, নিরস্কারিতা ও নিস্বার্থপরতা এই সব আলোচনা সব সময় লাগিয়াই ছিল। পরবর্তী জীবনে অন্নদা ঠাকুরের কাজ কর্মে তার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঠাকুরের স্বপ্নজীবন গ্রন্থে আরো সব অলৌকিক কাহিনি সম্বলিত ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছি স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই মহাপুরুষের জীবনী — বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুরের বাণী প্রচার করছে।

ইতিমধ্যে ১০টা নাগাদ মন্দিরের দ্বার খোলে গেল। আমরা সবাই মন্দির চত্বরে বসে আছি মুর্তি দর্শনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে। মধ্যাহ্ন আরতি ও ভোগ পর্ব সমাপ্তান্তে আমরা ভক্তরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে শ্রদ্ধাভরে ভোগ নিবেদন করি ও আশীর্বাদ নেই।

সেখান থেকে আমরা ৫ জন ১২টা নাগাদ ভোজনকক্ষের দিকে অগ্রসর হই। বিরাট কক্ষ ৫/৬ সারিতে আসন বিছানো রয়েছে। এক এক সারিতে ২০০ জন করে প্রায় ১০০০ জন আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। আমার নাতনি সাগরিকা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে — ছোট ছোট আশ্রমের বালকরা কি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করে যাচ্ছে — খিচুরী, লাবড়া, মিষ্টান্ন। আমরা তৃপ্তি নিয়ে সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করি। অবশ্য ২/৩ জন ব্রহ্মচারী সেখানে দাঁড়িয়ে তদারকী করছেন।

এই মন্দিরের পরিবেশ ও কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে একটা স্বর্গীয় সুচিতা বিরাজ করছে। সেটা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। একটা মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসলাম। ফেরার পথে কাশীপুর উদ্যান বাড়ি দেখার জন্য যাই কিন্তু বন্ধ থাকায় দেখা হল না।

উদ্যান খোলা থাকে ভোর ৫টা থেকে ১১টা। বিকাল ৪ থেকে ৯টা। আমরা ২টা নাগাদ ফিরে এলাম অনুপমা আবাসনে।

দীঘা শঙ্করপুর মন্দারমনি ও চন্দনেশ্বর সফর

হঠাৎ মেয়ের ফোন - বাবা চল দীঘা যাই। তোমার জামাতা হোটেলের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। কোন অসুবিধা নেই। আনন্দে সম্মতি জানিয়ে বললাম কবে যাওয়া। ২৩শে মে। তোমরা ৯টা নাগাদ খেয়ে দেয়ে রেডি হয়ে থাকবে। আমরা ১০টার মধ্যে পৌঁছে যাব। সেখান থেকে হাওড়া, ১১.৩৫ মিনিট দুরন্ত এক্সপ্রেস।

জামাতা অনিত, মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে ৯টা নাগাদ অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স-এ এসে গেছে। আমরা প্রস্তুত, যাত্রা শুরু। তিনদিনের জন্য দীঘা যাওয়া সময়ে পৌঁছে যাই হাওড়া ষ্টেশনে। ২টা নাগাদ ট্রেন হাজির। দুরন্ত এক্সপ্রেস — সাধারণ ট্রেনের চেহারা নয়। সমস্ত ট্রেন জুড়ে রয়েছে সবুজ বনভূমির চিত্র। সে এক নতুন বৈচিত্র্যতা নিয়ে দুরন্ত এক্সপ্রেস হাজির আমাদের তুলে নিতে। আমরা সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ি। ট্রেন ছাড়ে যথা সময়ে। কিছুক্ষণ পর সমস্ত ট্রেন জুড়ে ডাইনিং কারের কর্মীদের ব্যস্ততা প্রথমে সুপ দিয়ে গেল। তারপর খাবার এত সুন্দর ব্যবস্থা, অতটুকু ত্রুটি নেই। এই রকম খাবার আয়োজন আশা করা যায় না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমার ৮০ বছর দীর্ঘ সময়ে আমাকে পরিক্রমা করতে হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চাকুরির প্রয়োজনে। বাংলায় বসে আমাকে এই নতুন অভিজ্ঞতা নিতে হলো খানিকটা গর্ব বোধ হল। শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে। যথারীতি ভুরিভোজনে পর। মুখসুদ্ধি দিয়ে সমাপ্তি।

পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় বাসস্টপের কাছে সৈকত হোটেলে আশ্রয় নেই -

air conditioned রুম। সুন্দর ব্যবস্থা। মাসুল ১২০০ টাকা প্রতিরুমে প্রতিদিন। এখানের এক নতুন ব্যবস্থায় আমি মুগ্ধ, কত সহজে ইলেকট্রিক বিল নিয়ন্ত্রিত। বাহিরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে চাবি তুলে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক কানেকসন চলে যায়। অন্যত্র দেখেছি বেয়ারা ঘরে এসে চেক করে যেত যাত্রী যাওয়ার পর। সে রকম কোন ঝামেলা নেই। অতি সহজে ইলেকট্রিক বিল নিয়ন্ত্রিত।

সন্ধ্যায় বেড়িয়ে পড়ি একা—সমুদ্রের ধারে সি বিচে। ১৯৬২ সালে গিয়েছিলাম-তিন বন্ধু আমি, সামন্ত ও পোদ্দার। সেই সি বিচ আর নেই — সেই উন্মুক্ত বালুকা রাশি। এখন পাথর আর পাথর দিয়ে বাঁধানো, কোথায় সেই বালুকা রাশি-সব হারিয়ে গেছে। প্রকৃতিকে বেধে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হারিয়ে গেছে পুবো বিচটা পাথরে বাঁধানো, যাত্রীদের ভীড় আর দোকানের সারি। আস্তে আস্তে হেঁটে চললাম। সামনে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। চা খেলাম। ইতিমধ্যে খেযে জামাতা ও অনিঙ্ক সেখানে হাজির। তারপর সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে অপবপ্রান্তে চলে গেলাম। রাত্রি ৮টা - সবাই হেঁটে ফিরে এলাম। ২৪শে মে আমাদের ভ্রমণ সূচিতে রয়েছে - চন্দনেশ্বর মন্দির - দূরত্ব ১৩ মাইল। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। আমরা সবাই সেখান থেকে নেমে মন্দিরে যাই। শ্রদ্ধাভরে পূজা দিলাম। মন্দিরের কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এই ধামে জলযন্ত্রে শম্ভুর পূজা হয়। পূণার্থীদের ভীড় সারা বছর লেগেই আছে। গঙ্গাজল বাবার মাথায় ঢালে, নারিকেল ভাঙে, পঞ্চমৃত নিবেদন করে। মন্দিরের শান্ত ও সুন্দর পরিবেশে পুজো দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করে।

মন্দিরের দক্ষিণ পাশে জগন্নাথ দেবের মন্দির। উত্তর পাশে দুধকুন্ড আর একটি প্রাচীন বট গাছ। এক সময় এখানে গভীর অরণ্য ছিল। এখন এক্ সিদ্ধি যোগী এই্ গাছতলায় বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই কল্পবট এর নাম। যে যাহা মানত করে গিট বাঁধে তার বাসনা পূর্ণ হয়। উত্তরে বাবার কুন্ড। একটি লোককথা প্রচলিত (সংগৃহীত চন্দনেশ্বর চরিতামৃত বৃহৎ কাহিনিমালা) বঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তে দুর্গম হোগলা বন সেই দুর্গম বনের ধারে গেহ্নী নামে এক বিধবা তেলিনী থাকত

তার স্বামীর নাম ছিল সাউ। লছমী নামে তাদের একটি মেয়ে সুন্দরী, ভক্তিমতি ও বুদ্ধিমতি।

বাল্যকাল থেকে লছমী শিবপূজা করত। ঘরের কাজকর্ম কিছু জানত না। বয়স বাড়ল তাই দেখে লছমীর বিয়ে দিল পাশের গ্রামের এক যুবক কেশব সাউ এর সঙ্গে। শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামী। ওদের পাঁচটা দুধওয়ালা গাই ছিল লছমী কোন কাজ করেনা। কেবল শিব পূজা ও বই পড়া, বুড়া বুড়ি রেগে বলল ঘরের কাজ কর্ম কর না হলে গাইগুলো বনে চরিয়ে নিয়ে আস।" সকালে গাইগুলো বনে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় গাইগুলো বাড়িতে এলে, বুড়ি দুধ দুইত। প্রত্যহ দুধ কমতে লাগল। পরে একদিন গাইগুলো মোটেই দুধ দিলনা, বুড়ি রেগে গিয়ে লছমীকে গালাগাল দিয়ে বলল "তুই দুধ চুরি, করে খেয়েছিস। পরদিন যথারীতি গাইগুলোর পিছু ধরে বনে চলল। সন্ধ্যায় লছমী এক মনোরম কাননে এসে পৌঁছিল। সারি সারি বেল, চাপা নাগেশ্বর ফুলের গাছ। কত কুল, ফুল ও চন্দনের গন্ধে ভরপুর। পাশে চন্দনা নামে সুশীতল জলের ঝরনা বইছে। হঠাৎ বজ্রগম্ভীর শব্দে মাটি ফেটে এক গর্ত দেখা দিল। আকাশে গর্জন শুনা গেল, গাছ থেকে ফুল, ফল, বেলপাতা, সেই গর্তে পড়তে লাগল। লছমীর গাইগুলো হাম্বা হাম্বা রবে সেই গর্তের উপর দাঁড়াল। তাদের বাট থেকে দুধ ঝড়ে পড়ল। দুধ দেওয়া শেষ হতেই, সহসা সেই গর্ত বন্ধ হয়ে গেল। লছমী বিস্ময়ে হতবাক। গাইগুলো ফিরে গেল। লছমী সেখানে বসে পড়লেন, নমঃ শিবায় জপ করতে লাগলেন এক মনে একাসনে অনিদ্রায় দৃঢ় মনে লছমী শিবের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন ভক্তের মনোময় মূর্তি ধরে দর্শন দিলেন।

এদিকে শ্রীহরি পন্ডিত দল বল নিয়ে সারা জঙ্গল খুঁজে কোথাও লছমীর সন্ধ্যান পেলেন না। অবশেষে স্বপ্নে আদেশ পেলেন হোগলা বনে যাও। সেখানে লছমীর শাশুড়িকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন "লছমী দুধ চুরি করে নিই। দুধ আমি হরণ করেছিলাম। তুমি অকারণে তাকে মেরেছ। কাল লছমীকে ঘরে নিয়ে এস।" অবশেষে মহাদেব লছমীকে বরদান করলেন- "মা লছমী আজ থেকে আমি এখানে

চন্দনেশ্বর নামে আবির্ভাব হব। তুমি আমার প্রধান ভক্ত হবে। তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে সকলে আসছেন'' সবাইকে আমি আদেশ করেছি। যে যার কাজ পালন করবেন, এই কথা বলে অদৃশ্য হলেন। সেই স্থানে একটি সুরঙ্গ হয়ে গেল, তার আবির্ভাবের চিহ্নস্বরূপ

চন্দনেশ্বরের ধ্যান

গৌরীপতি; পশুপতিং শিবশক্তি কান্তিং

পথরাননং বৃষৎবানে মন্ত্রথবিং

শূল করে ভূজঙ্গ ভূষণ চন্দ্রমৌলিং

শ্রীচন্দনেশ্বর মহেশ্বর আশ্রয়মি

চন্দনেশ্বরের প্রণাম মন্ত্র

শিবং শান্তং মনোহরণং বিবরাভ্যন্তর স্থিতম হুগলী গ্রাম মধ্যস্থং বন্দে শ্রীচন্দনেশ্বরম চন্দনেশ্বর আবির্ভাব হবার পর বহু রোগী, পাপী তাপী তার দয়ায় মুক্তিলাভ করে। অদ্যাবধি বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে ও ঘটিতে থাকিবে। সেই সকল তথ্য চন্দনেশ্বর চরিতামৃত বৃহৎ কাহিনি মালায় উল্লেখ রয়েছে। মন্দির দর্শন করে সেখান থেকে আমরা যাই বালসৌরী বিচ। বিচ খানিক দূরে, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা বিচের পাড়ে আশ্রয় নিই। ডানদিক থেকে সুবর্ণরেখা নদীর ক্ষীণ ধারা সমুদ্রে মিশেছে। অপর দিকে রয়েছে গভীর অরণ্য। বিরাট প্রান্তর সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে রয়েছে অসংখ্য লালকাকড়া—ইতস্ততঃ খুরে বেড়াচ্ছে—আবার যাত্রীদের আগমনে গর্তে লুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা দূর থেকে সেই মনোরম দৃশ্য দেখছি। আমার জামাতা নাতি ও মেয়ে ৭০ টাকা দিয়ে মোটর বাইকে চলে গেল সমুদ্রের ধারে। বড় বড় গোল কাঁকড়া-হাজারো হাজারো বালির মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। এ দৃশ্যের বর্ণনায় ফাঁক থেকে যেতেই পারে। এসব দৃশ্যের

নিঁখুত বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। বিশাল সমুদ্র সৈকত-কোথাও সেই পাথরের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রতার আদি রূপ নিয়ে বেলাভূমিতে খেলা করছে। বালুকাময় সমুদ্র সৈকতের বিস্তৃতির তুলনা হয়না। মাঝে সুবর্ণরেখা তার ক্ষীণ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। জামাতা, মেয়ে নাতি ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। তারপর আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

25th May 2011

আজ বিকালে ৩.১৫ মি দুরন্ত এক্সপ্রেসে কলিকাতায় ফেরা। সকালের জল খাবার খেয়ে বাক্স পেটারা নিয়ে গাড়িতে। আজকের সফর সূচিতে রয়েছে ফতেপুর, রামনগর, তাজপুর, শঙ্করপুর ও মন্দামনি। প্রায় ৭০ কিলোমিটার আসা যাওয়া। মাইল দশ দূরে চম্পা ও হলদিয়া নদীর মোহনা - তারপর ফতেপুর ও রামনগর। বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে চিংড়ি মাছের চাষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অফিস রয়েছে মাছ সংগ্রহে ব্যস্ত। এখান থেকে মাছ বাহিরে চলে যায়। চিংড়ি মাছের আড়ত - ছোট ছোট বিরাট বাজার - ঝড়ে ভাঙ্গছে আবার গড়ছে। এর কিছুক্ষণ পর আমরা তাজপুর সী শোরে পৌঁছলাম। ছোট্ট সী বিচ সৌন্দয্যে অতুলনীয়। প্রকৃতির কোলে বালুকাময় সমুদ্র সৈকত। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে আমরা চা খাচ্ছি! আর দেখছি সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ও উত্তাল তরঙ্গ বালুকাময় বিস্তীর্ণ এলাকায় আছড়ে পড়ছে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে এ সৌন্দর্য্য উপভোগে একটা অলৌকিক আনন্দ। এ সব দৃশ্য আমার ৫০/৬০ বছর ছেড়ে আসা দিনগুলি আবার ফিরে পেয়েছি। সমুদ্রকে পাথর দিয়ে বেঁধে ফেলবে - কতটুকু - বিশাল সমুদ্র সৈকত — হাসছে মানুষের অপচেষ্টা দেখে। ইতিমধ্যে আমার মেয়ে জামাতা ও নাতিকে নিয়ে সেই জলের ধারে চলে গেছে বিশাল ঢেউয়ের সামনে।

তারপর প্রায় ১৫ মাইল — শঙ্করপুর। এদিকের সবচেয়ে বড় মাছের আড়ত সংরক্ষণ কেন্দ্র। এখানের গলদা চিংড়ির ডালা পৃথিবীর বাজারে ঘুরছে। শুনলে আশ্চর্য্য হবেন গলদা চিংড়ির মাথা বিদেশিরা আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন তাই কলিকাতার বাজারে গলদা চিংড়ির মাথা পাওয়া যায় - মাছ নয়। আর সরবরাহ

রয়েছে হোটেলগুলিতে। কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দূরের সেই সমুদ্রের ঢেউ একটার পর পাড়ে আছড়ে পড়া দৃশ্য উপভোগ করলাম। অবশ্য জামাতা অনিত, নাতি ও মেয়ে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পদস্খলন করল। কিছুক্ষণ খেলে শেষে ফিরে আসল। আমরা ঠান্ডা পানীয় ডাব খেলাম। এখানে সমুদ্রের ধারে রয়েছে ডাবের ঝাড়ি — সাইকেলে নিয়ে যাত্রীদের অপেক্ষায়।

তারপর মন্দারমনি ১টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম। সিন্ধু হোটেলের সামনে। হোটেলের চারিদিক উন্মুক্ত যাত্রীরা খাচ্ছে। উল্টোদিকে রয়েছে অতিথিশালা। তার মাঝ দিয়ে ৩/৪ মিঃ হেঁটে আমরা সমুদ্রে পৌঁছে যাই। সামনে মন্দারমনি সমুদ্র সৈকত। সেখানে ধু ধু বালি — আর বিচের মধ্যে রয়েছে — কিছু অস্থায়ী হোটেল বেআইনি ভাবে। মাঝে মাঝে তাদের খেসারত দিতে হয়। আমার নাতি মেয়ে জামাতা সহ বিচে নেমে গেছে - জলের ধারে কিছুক্ষণ ঢেউগুলির উচ্ছ্বাস উপভোগ ফিরে এসেছে। সেখানে থেকে ফিরে আসি সিন্ধু হোটেলে। হাতমুখ ধুয়ে যথারীতি বসে রইলাম খাবারের অপেক্ষায়। খোলা চারিদিকে — সমুদ্রের হিমেল হাওয়ায়, অলসতা যেন পেয়ে বসেছে। সব কিছু ধীর গতিতে চলছে। কোথাও যেন ব্যস্ততা নেই। হঠাৎ খেয়াল হল ৩টায় দুরন্ত ট্রেন। আমরা খাওয়ার জন্য হাক ডাক শুরু করলাম। খাবার এলো খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়িতে দীর্ঘ পথ দীঘা স্টেশন। নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তারপর সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরে আসি।

রায়চক সফর

আমার ছেলে ভাস্কর দাশ সাপুরজী পুলানজী কনস্ট্রাকসন কোম্পানির চাকুরি নিয়ে কলিকাতার অফিসে যোগদান করে ২০০৪ সালে। ইতিপূর্বে' বোম্বে পালভেলে হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকসনে সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাঁচ বছর চাকুরি করে। সেই চাকুরি ছেড়ে কলকাতায় এই অফিসে ম্যানেজমেন্টে সুযোগ পেয়ে, এখানে যোগদান করে। তাছাড়া বাবা মাকে কাছে পাওয়া যাবে। তাই অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স-এ বাবা মায়ের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয়।

ছেলে ভাস্কর রিজিওন্যাল ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় সাইট-এ যায় জামশেদপুর, মুর্শিদাবাদ, অমরকন্টক। আমি ছেলেকে জানালাম আমার ভ্রমণের নেশা।

তাই সে রায়চক বেড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ২৬শে জানুয়ারি ২০০৮ ছুটি, ২৭শে রবিবার। আমি সস্ত্রীক ভাস্কর, বৌমা ও নাতনি সাগরিকা ২৫ তারিখ সকাল ৭টায় কলকাতা থেকে রওনা হই। উত্তর ভারতে শৈত্য প্রবাহের কারণে ২-৩ দিন যাবৎ ঝির ঝির বৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু। ডায়মন্ডহারবার রোড বেহালা আমতলা হয়ে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন মোড় হয়ে আমরা ডান দিকে ১০ কি.মি. দূরে রায়চক পৌঁছে যাই বেলা ১১ নাগাদ। রেডিসন পাঁচ তারা হোটেলে ১১সি চন্দ্রা সুট কলকাতা থেকে ছেলে বুক করে রেখেছিল। ৩ বেড রুম সুট। সুন্দর ব্যবস্থা টিভি, পিয়ানো শিশুদের নানাবিধ খেলনার সামগ্রী রয়েছে। একটা নতুনত্ব রয়েছে। ১০০ একরের ওপর জায়গা নিয়ে এই হোটেলে, মূল হোটেলের চারিদিকে সব দোতালা, করেছে এক একটি কটেজে ২/৩টি সুটে চারিদিকে আলো বাতাস অপর্যাপ্ত। হোটেলের কর্মীদের কাছে জানতে পারলাম। হেল্‌থ রিপোর্ট-এর তালিকায় রায়চক এই রেডিসন হোটেল এর যথেষ্ট সুনাম আছে। সরকারী, বিভিন্ন কোম্পানি কর্মচারী, ট্যুরিস্টদের ও সিনেমার সুটিং এর

বেডিসন হোটেলে অতিথিশালায ছেলে ভাস্কব ও বৌমা বিযাস
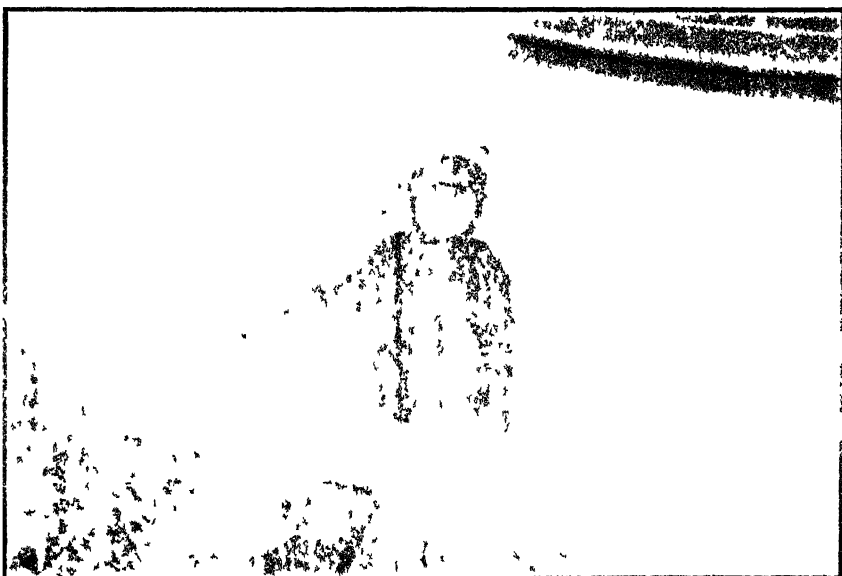
নাতনি সাগবিকা হোটেলেব এক বাগানে

ভীড় লেগেই আছে। তবু যেন মনে হল খুবই শান্ত সুন্দর পরিবেশ। আমরা ১২টা নাগাদ প্রাতঃরাশ খেয়ে বেড়িয়ে পড়ি গাড়ি নিয়ে হোটেল থেকে বেড়িয়ে রায়চক মোটরস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ধর্মতলা বাস যাতায়াত করছে। পাশে রয়েছে ফেরী ঘাট। খবর নিয়ে জানলাম রায়চক থেকে ধর্মতলার বাস ভাড়া ২৪ টাকা। ফেরী ঘাট থেকে লঞ্চে কুমারীহাটি ফেরী ঘাট লোক যাওয়া আসা করছে। ভাড়া ৮ টাকা। এক একটি লঞ্চ আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের লাইন পড়ে যাচ্ছে— তারপর বাস ছাড়ছে। লঞ্চের যেমন নির্দিষ্ট টাইম সিডিউল রয়েছে - তার সঙ্গে বাসের টাইম সিডিউল রয়েছে। ঐ পাড় থেকে অর্থাৎ হলদিয়া থেকে দলে দলে যাত্রী আসছে আর বাসে উঠছে। খবর নিয়ে জানলাম অনেকে কলকাতা থেকে যাতায়াত করে হলদিয়ায় চাকুরি করছে। রায়চকে জন বসতি খুবই কম দোকান পাট তেমন নেই। খবর নিয়ে জানলাম সরিসার মোড়ে গিয়ে বাজার করতে হয়। আশে পাশে কোন বড় বাজার নেই। এখানকার লোকদের পেশা হচ্ছে নদীতে মাছ ধরা। নৌকা নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। এখানে চিংড়ি মাছের চাষ হয় অবশ্য একটু দূরে। শুনেছি মাছ বিদেশে যায়। সন্ধ্যায় রেডিসান হোটেল দেখতে পেলাম - সংস্থার মূল বিল্ডিং এই অবিরাম বৃষ্টিতে, সেখানে গিয়ে কিছু দেখা হল না। তারা জানাল সকালে ৮টায় আসবেন।

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি ভোর ছয়টায় উঠে পড়ি। তারপর যথারীতি কিছুক্ষণ রামদেবের নির্দেশিত আসন করি। তারপর প্রাতঃকালীন কাজকর্ম সেরে ছাতি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে দেখি এ বি সি ডি করে এইচ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি ব্লক (বিল্ডিং) রয়েছে প্রত্যেকটিতে ২/৩টি করে অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে ১ রুম, ২ রুম আর ৩ রুম ফ্ল্যাট, রয়েছে শিশুদের খেলার সামগ্রী, পিয়ানো টেলিভিশন ইত্যাদি।

ছাতি নিয়ে সকালের প্রাতঃভ্রমণ। ঝিরঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। অ্যাপার্টমেন্ট চারিদিকে, মাঝে রয়েছে আলোর মালায় সাজানো জলের ফোয়ারা। ডানদিকে রয়েছে দোকান, রেস্তোরাঁ রিসেপ্সন কাউন্টার, কোথাও লোকজন নেই। কাউন্টার

দুটিতে মেয়ে বসে আছে। আমি আগ্রহ নিয়ে কাউন্টারে প্রবেশ করলাম। বাঙ্গালী মেয়েটি গ্রিট করল। হোটেলের কিছু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি মাত্র গতকাল এখানে চাকুরিতে যোগদান করেছে। তাই তেমন কোন তথ্য পেলাম না। সিনিয়ারদের জিজ্ঞাসা করে সংগ্রহ করে এনে দিল। এ হোটেলের মালিক হর্ষ বর্দ্ধন নেওয়াটিয়া। এটি একটি প্রাইভেট কোম্পানি অম্বুজা গ্রুপের। মেয়েটির নাম নেহা পাল। শিলিগুড়ি বাড়ি। সে জানাল হোটেলের নিজস্ব ৩১টি রুম অ্যাপার্টমেন্ট আছে। আমরা ১১সি ৩ বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টে আছি জানাতে সে বলল সেটা হোটেলের নয় প্রাইভেট। এই বাড়িগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে — নিজেদের প্রয়োজনে, তারাই পরিচালনা করে। বাড়িগুলির কোনটার নাম ছন্দা কোনটা 'শান্তি'। প্রত্যেকটি বাড়ি দোতালা ২/৩ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। রয়েছে সমস্ত রকম সুবিধা, এখানে অতিরিক্ত দেখলাম পিয়ানো শিশুদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা এই বাড়িগুলি কিনেছে তারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ছেলে ভাস্করের অফিস এই বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে অফিস ম্যানেজার কাম কুক আমাদের খাওয়া দাওয়া থেকে সমস্ত রকম বিষয়ে দেখাশুনা করছে। এটা ৩ রুম ফ্ল্যাট আমাদের প্রয়োজন ভিত্তিক রান্না বান্নার ব্যবস্থা। এমন কি জল খাবার তাও আমাদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে। একদিন আলুর পরোটা, একদিন লুচি বেগুন ভাজী। স্বাস্থ্যকর জায়গা তাই ক্ষুধা হয়। দুই দিন এই বৈচিত্র্যতার মধ্যে কেটেছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, কমপ্লেক্স এরিয়াতে গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। তাছাড়া রাস্তাগুলিও উপযোগী নয়। ছোট ছোট মসৃণ লাল সাদা পাথর দিয়ে রাস্তা। হাঁটতে যথেষ্ট অসুবিধা। কাদা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এসব দেখে ভাবছি — কি সুন্দর বৈবভ ও প্রাচুর্য্যের সমাহার কিন্তু কাদের জন্য সমাজের এই উচ্চবর্গের লোকদের তাদের অবসর বিনোদনের জন্য কোথাও অতটুকু ত্রুটি নেই। সুসজ্জিত রেস্তোরাঁ রয়েছে, রয়েছে নাচগানের আসর — সেখানে উদ্দ্যাম নৃত্য তরুণ, তরুণীদের। কোথাও চলছে মদের আসর, কোথাও বিলিয়ার্ড খেলা অবসর বিনোদনের এতটুকু ত্রুটি রাখেনি। মূল হোটেলে বিভিন্ন কক্ষে সুসজ্জিত স্থানের ব্যবস্থা সুগন্ধ যুক্ত বাথটবে। আর আসন ও বডি ম্যাসেজের ব্যবস্থা।

খবব নিয়ে জানলাম কারা এখানে আসেন, কোম্পানির বিভিন্ন কর্ম কাণ্ড, সিনেমা শিল্পী, খেলোয়াড়, সরকারের উচ্চ পদস্থ অফিসার, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদবা। মিটিং উৎসব ইত্যাদি লেগেই আছে। মাঝে মাঝে চলছে সিমেনার সুটিং। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের অজানা, আমাদের মত লোকদের প্রবেশ নিষেধ আর্থিক কারণে।

সন্ধ্যায় আবার বেড়াতে বেড়িয়ে পার্কের পাশে ষ্টেশনারী সপ, রিসেপসন কাউন্টারে সেখানে কয়েকটা পত্রিকা রয়েছে। কিছুক্ষণ রিসেপসন রুম-এ বসে পত্রিকাগুলি পড়লাম। ও পাশ থেকে ভেসে আসছে নাচ গানের জম জমাট সোরগোল। কিছুটা উৎসুক্য নিয়ে ঢুকে পড়লাম রিসেপসনে, এ খবর নিয়ে জানলাম ইভেন্ট সব সাজিয়ে বসে আছে বিশাল আসর কোথাও কাউকে দেখলাম না রেস্তোরাঁয় বসে খেতে। বৃষ্টি চলছিল হয়ত তাই। সামনে দেখি ছেলে ভাস্কর মেয়ে সাগরিকাকে নিয়ে এদিকে আসছে। সামনে ও পাশে স্টেশনারি দোকান ঢুকে কিনলাম সাগরিকার জন্য। খবর নিয়ে জানলাম - এখানে সব জিনিসের ৩০ শতাংশ বেশি মার্কেট দাম থেকে। সন্ধ্যা ৯টায় ফিরে আসি।

২৮ তারিখ রবিবার ভোরে যথারীতি ৬টায় ঘুম থেকে ওঠে বেড়িয়ে পড়ি প্রাতঃভ্রমণে। এখানে প্রাতঃভ্রমণে অন্য রকম মাদকতা আছে। আছে চারিদিকে বিভিন্ন ফুলেব সমাহার অবশ্য বৃষ্টিতে তাদেব কিছুটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। এই কমপ্লেক্স এর বাহিরে বায়চক জেটি আর ওপাড়ে রয়েছে কুকড়াহাটি হলদিয়া মাঝখানে হুগলী আর রূপনারায়ণের সংগম। এর পরই সমুদ্র।

তারপরই রয়েছে সারি সারি বাস যাবার অপেক্ষায় যাত্রী নিয়ে ধর্মতলায় উদ্দেশ্যে। যাত্রীরা সবই হলদিয়া থেকে লঞ্চে আসছে। এদিক দিয়ে কলিকাতা যাওয়া সুবিধা।

কমপ্লেক্স এর গেটের ডানদিকে রয়েছে হোটেলের সাইনবোর্ড 'হোটেল' নয় লেখা রয়েছে দ্য ফ্রন্ট র‍্যাডিসেন রিসোর্ট এন্ড স্পা পাঁচ তারা হোটেলের মর্যাদা নিয়ে।

ফিরে এসে যথারীতি স্নান সেরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যথারীতি প্রস্তুত ব্রেকফ্রাস্ট এর জন্য। ৯টা নাগাদ র‍্যাডিসেন কে বিদায় জানিয়ে ফেরার পথে নেমে পড়ি। ১০ কিলোমিটার গিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডের ডানদিকে সরিসা রামকৃষ্ণ মিশন। আশ্রম খুব একটা বড় নয়, তবে যথেষ্ট সুনাম আছে। প্রবেশ পথে যেতে প্রথমে পড়ে ডানদিকে সরিসা রামকৃষ্ণ হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল। এ স্কুলের ফলাফল বরাবর ভাল, ছাত্রদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। বাঁদিকে ঘুরে ডান পাশে মূল মন্দির, আমরা মন্দিরের ভিতরে যাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সব মন্দিরের গঠনশৈলী মূর্তি অবস্থান এক রকম। এখানে রামকৃষ্ণের মূর্তি শ্বেতপাথরের দু'পাশে রয়েছে সারদা মা ও বিবেকানন্দের ফটো। মন্দির চত্বরে চারিদিকে উপরে পর পর রয়েছে মঠের মহাঅধ্যক্ষদের ছবি ব্রহ্মানন্দ থেকে শিবানন্দ, প্রেমানন্দ, অভেদানন্দ বিজ্ঞানানন্দ আরো অনেকে।

মন্দিবের সামনে রয়েছে একটি জলাশয় আর রয়েছে ফুলের বাগান। সামনে এগিয়ে গিয়ে পাই, হোস্টেলের ছাত্রদের সবাই থালা নিয়ে যাচ্ছে ব্রেকফাস্ট এর জন্য।

আমরা ফিরে এসে গাড়িতে উঠি, রওনা দিই ডায়মন্ড হারবারের উদ্দেশ্যে। ১০টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার শহর টি ছাড়িয়ে কাকদ্বীপের রাস্তায় নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছি। এখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল টুরিস্ট লজ "সাগরিকা"। আমরা ২ টাকা করে টিকিট করে বিশ্রামের জন্য ঢুকে পড়ি। ভিতরে গিয়ে দেখি কোন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, হয়ত বিয়ে। ২৭শে জানুয়ারি বিয়ের তারিখ। সব ব্যবস্থাই রয়েছে। কন্‌ফারেন্স হল রয়েছে যথেষ্ট প্রশস্ত সুসজ্জিত। এদিকে হলে ফুল ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক নিয়ে কাজ করছে — বিবাহ বাসরের তৈরির জন্য।

আমরা বেড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে ও পাশে নদীর ধারে বাঁধানো পথে বিচরণ করলাম। ও পাশে দেখা যায় না ও পাশে রয়েছে মেদিনীপুরে মহিষা দল কিছু হকার বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে। আমি অনিষ্কের (নাতি) জন্য নিলাম একটি তাল পাতার টুপি। চমৎকার জায়গা শহরের বাইরে হাওয়া, পরিবেশ শান্ত ওপারে

গিয়ে আমবা সবাই ডাব খেলাম। তারপর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা। পথে আশ্রম মোড়ের পাশে লেখা দেখলাম ফলতা স্পেশাল ইকনমিক জোন। এখন প্রায়ই পত্রিকায় সেজ নিয়ে বিভিন্ন রকম তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। মনে হচ্ছ গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি এই সেজ। সেজ স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট আগ্রহী। হলদিয়ার নয়াচড়ে সেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তারপর আমতলা, জোকা, ঠাকুর পুকুর, বেহালা হয়ে আমরা কলকাতা শহরে প্রবেশ করি। বেলা ১১.৩০ টা নাগাদ অনুপমা আবাসনে পৌঁছি। ২ দিনের এই ভ্রমণ সূচির এক নতুনত্ব স্মৃতি হয়ে রইল মানসপটে।

বাসে বিহার সফর

সে আজ কত কাল, তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল। স্মৃতি মধুর হলে সজীব থাকে। অনেকদিন হয়ে গেল তবু মানসপটে সেই সব দৃশ্য ভেসে উঠে। সেদিন "স্টার আনন্দে" সন্ধ্যায় সুচিত্রা ও অশোক কুমারের তোপচাচিতে সেই নৌকা বিহার দেখে, সেই ভ্রমণ কাহিনীর কিছু লেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

সাল ১৯৬২, আমি তখন যুবক, কলিকাতায় ২৩/বি কানাই ধর লেনে থাকি পড়াশুনা করছি (এম.কম) ও কস্টিং। আমাদের মেসে একজন এল.আই.সি. অফিসে কাজ করতেন, তিনি আমাকে এই বিহার সফরের আমন্ত্রণ জানালেন—বাসে তিন দিন।

আমরা ৩০ জন এক সন্ধ্যায় বাসে বেড়িয়ে পড়ি। যাত্রীদের বেশির ভাগই এল.আই.সি-র কর্মচারী। সময়টা ছিল পূজার ছুটি। সারা রাত্রি বাসে—খুব ভোরে হুড্রো ফলস এ পৌঁছে যাই। বিরাট বিস্তীর্ণ হুড্রো ফলস্ এ পৌঁছে যাই। বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এই ফলস - বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার জল পড়ছে।

চারিদিক কুয়াশায় অন্ধকার। আমরা সবাই বাস থেকে নেমে পড়ি। কুয়াশার অন্ধকারে এই সুযোগ নিয়ে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলির পিছনে বসে পড়ি প্রাতঃকৃত্য সারতে। তারপর যথারীতি হাতমুখ ধুয়ে আমরা সবাই বাসে ফিরে আসি। বাসে এবার রাঁচির অভিমুখে। পথে ৯টা নাগাদ আমরা জোনার ফলস এ পৌঁছে যাই। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে বিরাট বিরাট পাথরের চাই — ফাঁকে ফাঁকে জলের ধারা কোথাও কোথাও ৪/৫ ফুট উপর থেকে ঝর্ণা আবার কোথাও ঝির ঝির জলের ধারা। আমরা পাথরের ফাঁকে গামছা সাবান নিয়ে বসে পড়লাম — স্নানের

জন্য। প্রকৃতিক এই পারবেশে ছোট ছোট গাছের ঝোপ, এখানে জলের ধারা ও ঝর্ণায় আমাদের স্নান পব সত্যিই আনন্দের এক নতুন মাত্রা এনে দিল।

সেখান থেকে বাসে আমরা ১০টা নাগাদ রাঁচি পৌঁছে গেলাম। সেখানে সবাই মিলে রাঁচি হোটেলে গিয়ে প্রাতঃরাশ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সারারাতে বাসে এই ভ্রমণ — ক্লান্তি ও ক্ষুধা দুইই প্রাতঃরাশ নেওয়ার তাগিদ বেড়ে গেল। ধোসা নিয়ে বসে গেলাম। তারপর চায়ের পর্ব সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। আবার যাত্রা শুরু — ৮-১০ কি.মি. দূরে রাঁচি হিলস্। নীল আকাশের বুকে রাঁচি হিলের দৃশ্য মনোরম ও উপভোগ্য। বিশেষ করে সুর্যাস্তের সময়।

সেখান থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থান রাঁচি পাগলা গারদ পাগল নিয়ে অনেক গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। পিতা পাগল ছেলেকে দেখতে যায় পাগলা গারদে আর এক পাগলা পথ অবরোধ করে "আমার নাচ দেখে যান"। পাগল দের এরকম অনেক অদ্ভুত কাহিনীর উপর অনেক নাটক, উপন্যাস রয়েছে। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে হাজারীবাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাই। হোটেলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে আমরা বাসে চলে যাই অভয়ারণ্য বন দপ্তরে। তাদের গাড়িতে রাত্রি ৮টা নাগাদ অভয়ারণ্য দেখার ব্যবস্থা হয়। আমরা তাদের গাড়ির ভিতর থেকে চারিদিকে তাকাচ্ছি — কোথায় বাঘ কোথায় হরিণ, কোথায় বানররা বিচরণ করছে। বাসের উপর থেকে বনকর্মীরা জোড়ালো সার্চ লাইট চারিদিকে ফেলে চলেছে বানর, হরিণ, শেয়াল সবই দেখলাম—কিন্তু বাঘের দেখা পেলাম না। যাহা অস্পষ্ট দেখলাম বাঘের তিনটি ছানা — সার্চ লাইটের আলোতে চোখ ঝল ঝল করছে। বিশাল অরণ্য, প্রায় ২ ঘণ্টা সময় নিয়ে পরিক্রমা করলাম। তারপর হোটেলে ফিরে আহারাদি সেরে বিশ্রাম।

পরদিন স্নান প্রাতঃকৃত্য সেরে বেড়িয়ে পড়ি ৮টা নাগাদ — গন্তব্যস্থল তোপচাচি লেক — যার সঙ্গে জড়িয়ে "হাসপাতাল" ছবির সুচিত্রা সেন ও অশোক কুমারের নৌকা বিহার। আমরা যাত্রীরা সবাই যুবক ৩০-৩২ বয়স। যতই আমাদের

বাস তোপচাচি লেকের দিকে এগোচ্ছে, আমাদের আগ্রহ উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়, বাসে এক বিরাট শোরগোল। সন্ধ্যায় বাস তোপচাচি লেকের কাছে একটি ধাবায় থামে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিছুই দেখা যাবে না তবু যেতে হল — অন্ধকারে কিছুই দেখাগেল না। হতাশ হয়ে ফিরে আসি। এই তোপচাচি লেক থেকে বিহারের পাটনা শহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা।

রাত্রিতে ধাবায় আহারাদি সেরে আমরা সবাই রাত্রির মত বিশ্রাম ও নিদ্রার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। কিছু চলে যাই, নিকটবর্তী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। আমরা কয়েকজন বাসেই রয়ে গেলাম। বাকীরা ধাবায় খাটিয়া নিয়েছে।

পরদিন ভোরে সমস্যা — প্রাতঃকৃত্যের। চারিদিকে উন্মুক্ত মাঠ। মাঝে ঝোপ জঙ্গল রয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে কেউ বোতলে বা ঘটিতে জল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে। আমরা কয়েকজন জল জঙ্গলের সহ অবস্থিতির খোঁজে বেড়িয়ে পড়ি, প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে আসি ধাবায়। রুটি তরকারি নিয়ে ভুরিভোজ সেরে নিলাম চা সহযোগে। তারপর আমাদের আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু তোপচাচি লেক। উঁচু পাড় থেকে দেখলাম ২০-২৫ ফুট নীচে জলাশয়ের বিস্তীর্ণ জল রাশি প্রভাতের সূর্য্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। আমরা মসৃণ সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে চলে গেলাম প্রবল উত্তেজনা নিয়ে নৌকার পাশে। কয়েকজন উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস প্রশমনের জন্য জলে নেমে পড়ল — তাদের আনন্দের সেই জলকেলির দৃশ্য ভুলবার নয়। আমরা উপভোগ করলাম। কয়েকজন চলে গেল নৌকায়, কিছুক্ষণ নৌকা বিহার করল সুচিত্রা সেনকে পাশে নিয়ে অশোক কুমারের ভূমিকায় হাসপাতাল ছবিতে। এই সবই কল্পনা। যৌবনের এই উচ্ছলতার দৃশ্য সত্যিই মানোরম। মনটা পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। আবার কবির একটা লাইন মনে পড়ল "যৌবনের এই উচ্ছলতায় নিজেরা করি অপমান"। সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা রওনা হলাম নালন্দার উদ্দেশ্যে। সকাল ১০টায় নালন্দায় পৌঁছে গেলাম। নালন্দার ধ্বংস স্তুপের সামনে নির্বাক দাঁড়িয়ে — নালন্দার প্রাচীন ঐতিহ্য স্মৃতিতে আনতে চেষ্টা করলাম। এখানে কিছু তথ্যের পরিবেশন অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় — পৃথিবীর একটি অতি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় — আজও মানুষের মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সদা জাগ্রত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নালন" মানে পদ্মের বোঁটা বা নল আর "দা" মানে দাতা। নালন্দা মানে (!)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দিতে এই ঐশ্বর্য্যমন্ডিত বিশাল প্রাসাদ তৈরি হয়। এর কারুকার্য্য শৈল্পিক স্থাপত্যে গুপ্ত যুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রভাব রয়েছে বৌদ্ধ স্থাপত্যের। এখানে ১০,০০০ ছাত্র ও ২০০০ শিক্ষক ছিলেন। যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত — বুদ্ধ ধর্ম, হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর বিদেশী এখানে শিক্ষা লাভ করত। ক্রমে ক্রমে এর সম্প্রসারণ ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। ১২শ খৃষ্টাব্দে উন্নতি চরম শিখরে আরোহন করে। এখনও ধ্বংসাবশেষ থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ছাত্রাবাস, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাধন ক্ষেত্র, ঐশ্বর্য্যমন্ডিত লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ—তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১২০০ খৃস্টাব্দে মোগল সম্রাটের সেনাপতি বক্রিয়ার খিলজি এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন — অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায় হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থ। ছয় মাস ব্যাপী এই অগ্নিশিখা — বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করে — দেওয়ালে এখনও এর চিহ্ন মিলে। এ ভাবে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ভান্ডারের অবলুপ্তি ঘটে।

কতক্ষণ এভাবে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে সেই অতীতের চিন্তায় মসগুল খেয়াল নেই। আমরা সহযাত্রীরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক্রমা শেষে আমাকে বাসে যাওয়ার তাগাদা দিচ্ছে — আমার সম্বিত ফিরে এল। আমি আস্তে আস্তে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসে ফিরে এলাম। আমরা শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি। পাপনাশম হয়ে রাজগীর— তারপর সারারাত বাসে কলকাতার পথে।

কাছেই পাপনাশম জৈন মন্দির। পদ্ম ও শাপলা ফুল শোভা পাচ্ছে চারদিকের

বিস্তীর্ণ জলাশয়ে তার মাঝে মন্দির। এই জৈন মন্দিরের বৈশিষ্ট্য — নির্দিষ্ট সময়ে নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি।

সেখান থেকে রাজগীর বাসে ঘণ্টা দুই। আমরা রাজগীর পৌঁছে গেলাম, সেই ইপ্সিত উষ্ণ প্রস্রবনে স্নানের জন্য সবাই গামছা হাতে বাস থেকে নেমে পড়লাম, শান বাঁধানো একটা বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায়, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়লাম— চারিদিকে দেওয়ালে ১০/১২টি নল দিয়ে সিংহের মুখ দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবনের জলের ধারা পড়ছে। আমরা সবাই বসে গেলাম স্নানে। প্রথমে তপ্ত জল সহ্য হচ্ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে প্রস্রবনে স্নানের আরাম উপভোগ করতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়ে স্নান সেরে ফিরে আসলাম বাসে। তারপর হোটেলের খোঁজে, খাওয়া সেরে বিশ্রাম, ছোট শহরটির পরিক্রমায় বেড়িয়ে পড়লাম। রাজগীরের বিখ্যাত পেঁড়া সংগ্রহ করতে কেউ ভুল করলাম না। সারা রাত রাস্তায় কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা। ভোর ৮টা নাগাদ কলকাতায় পৌঁছে গেলাম। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে — তিনদিন চার রাত্রি বাসে বিহার ভ্রমণ — খরচ জনপ্রতি ২৫০ টাকা কেউ বিশ্বাস করবে। না, সে আজ ৪৮ বছর আগে ১৯৬২ সালের কথা।